শিক্ষায়তন

পরিব্রাজক

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯
প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীবিন্দু পাল
স্কেচ—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

শিক্ষায়তন

প্রস্তাবনা

[শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, অগ্রজ প্রতিমেষু, এই প্রবন্ধগুলি সংকলনে আমাকে সচেষ্ট করেছেন। তার পরামর্শ, সাহায্য এবং সহানুভূতি না থাকলে একাজ কখনোই সম্ভব হতো না।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠান এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

সারা কলকাতার সব প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির তথ্য-সংগ্রহ এতে নেই। তবে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের গোড়ার দিনের একটা ছবি এই প্রবন্ধগুলিতে ধরে তোলবার চেষ্টা করেছি। উত্তরকালে এই পথে যদি কোনও গবেষক অগ্রসর হন এ-পুস্তকে তার জন্য কিছু মালমশলা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

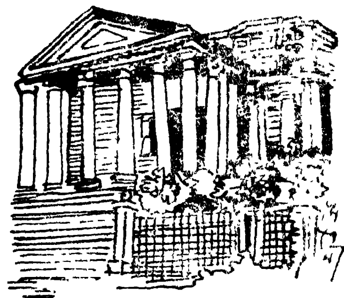
—পরিব্রাজক]

খুকুকে—

সূচী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সিনেট হল

ওদিকে সিপাহী বিদ্রোহ চলেছে, আর এদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, এমনি এক সময়ের কোলকাতার একটি চিত্র এঁকেছেন লেখক, 'তখন কোলকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্জ্বোলিত। ইংরাজের সিংহাসন প্রবল স্রোতের মুখে জীর্ণ তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে।' এমনি সময়ে স্থাপিত হ'ল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।



পুরাতন সিনেট হল

বাঙ্গালীর আজকের সাংস্কৃতিক জীবন কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। যেমন কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু কলেজ ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক্ সোসাইটি প্রভৃতি। এই সাংস্কৃতিক জীবনের মূল খুঁজতে গেলে আজ থেকে দেড়শো'রও বেশী বছর পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে সেই দিনে যেদিন ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে জমি কিনে কলিকাতা মাদ্রাসার প্রবর্তন করেন। তাঁর এই মাদ্রাসা খোলার পেছনে যে কোনও কারণই থাক না, পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনে তা অনেকখানি বিপ্লব এনেছে এতে কোন সন্দেহই নেই। ১৮০১ সালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজ সেই

সাংস্কৃতিক জীবন গড়ার কাজ আরো এগিয়ে দিল। খানাকুলের বামুন রামমোহন রায় যে একটা স্কুল করলেন তাতেই মধুসূদন, দীনবন্ধু, ভূদেব, প্যারীচাঁদ থেকে সুভাষচন্দ্র অবধির দীক্ষা হোল। ডিরোজিওর চেলারা দেশের দৃষ্টিভঙ্গিই যেন পালটে দিল। ১৮২৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার গোঁড়া কর্তৃপক্ষকেও যা দেখে ইংরাজীর ক্লাস খুলতে দেখা গেল।

হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজকে সবচেয়ে বড় জিনিষ যা দিল, তা হোল বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক জীবনের এই বনিয়াদ। ঘর, বাড়ী, লাইব্রেরী, অধ্যাপকদের বাদ দিয়েও এই ট্র্যাডিশনই হোল তার সবচেয়ে বড় সম্পদ যা তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কথা উঠল, প্রেসিডেন্সী কলেজে হিন্দু ও মুসলমান সব ছাত্রই পড়বে। এবং সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা হোল এটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে ঢেলে সাজানো হবে। ১৮৫৪ সালের ৩০ই মার্চ্চ তদানীন্তন বাঙলা সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন কোম্পানীর কাউন্সিল অব এডুকেশন। বাঙলা সরকার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পাঠালেন ভারত সরকারের কাছে, কিন্তু এর মধ্যেই ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণেই একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রস্তাবটির আর প্রয়োজন হোল না।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো স্থানাভাব। প্রেসিডেন্সী কলেজের নিজেরই তখন কোনও বাড়ী নেই। সংস্কৃত কলেজের একাংশে তার কাজ চলছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কাউন্সিল রুমে ১৮৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারী প্রথম সিনেটের সভা বসল। সিনেটের সদস্য সংখ্যা আটত্রিশ, যার মধ্যে মাত্র ছয় জন

ভারতীয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। সভার বিষয় বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালাবার জন্য একটি প্রভিশিনাল কমিটি (পরে তাই সিণ্ডিকেট) গঠন। কমিটির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গা দেখার ভার দেওয়া হোল,—এমনি এক সময়ে—যখন সিপাহী বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠেছে সারা ভারত জুড়ে।

সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ক্যামাক ষ্ট্রীটে ঘর ভাড়া নিয়ে রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস খুললেন যথারীতি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ যা প্রথমে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসএর কয়েকটি কক্ষ নিয়ে কাজ করছিল তা পাকাপাকি ভাবে ১৮৫৬ সালের শেষে শিবপুরে উঠে গেলে এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট, ফ্যাকাল্টি ইত্যাদির সভাগুলি মাঝে মাঝে হতে লাগল।

নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ভার দেওয়া হোল পরীক্ষা গ্রহণের। ১৮৫৭ সাল থেকেই পরীক্ষা গ্রহণের কাজ সুরু করা হোল। প্রথম বছরে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪৪ জন, ১৮৬২ সাল নাগাদ তাই বেড়ে দাঁড়াল ১,১১৪ জনে। ক্রমে তা বেড়ে গেছে আরও। ১৮৮২ তে ৩,৮২৭, ১৯০২ এ ৮,১৫০, ১৯১৭ তে ২৮,৬১৮ এবং উত্তরোত্তর তা বেড়েছে আরও অনেক বেশী হারে। কলিকাতা টাউন হল ভাড়া নিয়ে প্রথম প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হোত। কিন্তু তাতে অসুবিধা হোত নানা রকমের। কখনও হয়তো দেখা গেল একতলায় ছাত্রেরা পরীক্ষা দিচ্ছে, দোতলায় তখনই হয়তো কোনও ড্রামাটিক ক্লাবের নাচ গানের রিহার্সাল বসলো। মাঠে তাঁবু খাটিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, বিশ্বাস করুন আর নাই

করুন, এমনকি তাঁবুর ভিতরে বসে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসহ্য গরমে অজ্ঞানও হয়ে পড়েছে কেউ কেউ।

রকম সকম দেখে ১৮৬২ সালের ১৪ই জুনের সিনেট সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব বাড়ী অবিলম্বে চাই, যেখানে থাকবে (১) মস্ত বড় একটি হল, (২) একটি লাইব্রেরী, (৩) একটি রিডিং রুম, (৪) সিনেটের মিটিং এর জন্য একটি আলাদা কক্ষ (৫) রেজিষ্ট্রারের অফিস, (৬) চ্যান্সেলারের ঘর (৭) রেকর্ড রুম ও অফিস, (৮) এবং (৯) দু'টি প্রশস্ত হল ঘর যেখানে বসে ছাত্ররা পরীক্ষা দেবে।

ভাঙ্গা সিনেট হলের জায়গাটির সামনে দাঁড়ালে সেদিনের সেই ছবি মনে পড়বে। ১৮৬৪ সালের গোড়ায় যে দিন বাংলার গভর্ণর সারা সহর ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এমনি একটি হল তৈরী করবার জন্য স্থান নির্ব্বাচনের আশায় তখনকার ভাইস্‌চেন্সেলারকে সঙ্গে নিয়ে। ১৮৬২ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি জানালেন, কলেজ স্ট্রীটের পশ্চিমে হিন্দু কলেজের পাশে জলের ট্যাঙ্কের বিপরীত দিকের খোলা জায়গাটির চেয়ে ভালো কিছু আর পাওয়া যাবে না···ইত্যাদি। ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সিনেট হাউসের নক্সা তৈরী হ'ল, সরকারী স্থপতি গ্র্যানভিল জানালেন এর জন্য যে জমি তার দাম পড়বে ৮১,৬৬০ টাকা, বাড়ীর জন্য ১,৭০,৫৬১ অর্থাৎ সিনেট হাউস তৈরী হতে মোট খরচ পড়বে ২,৫২,২২১ টাকা।

কলেজ স্কোয়ার ট্যাঙ্কের দিকে মুখ করে সেই বিশাল ভবনটি সেদিনও দাঁড়িয়ে ছিল একই ভাবে শতবর্ষ ধরে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, ওদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজ; সামনে সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু, হেয়ার স্কুল। গ্রীক শিল্প পদ্ধতিতে গড়া বিশালকায়

এই বাড়ীটির স্তম্ভরাজি স্বভাবতই আপনাকে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য বিহ্বল করেছে। বিস্তৃতকায় সিঁড়ি, বিরাট অলিন্দ, প্রকাণ্ড বারান্দা এবং যাট সত্তর ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাটির প্রতি একটা সম্ভ্রম আপনার মনে জাগতোই।

আগেই বলেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম ধারক। তার সেই সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে বিশালকায় এই অট্টালিকাটির যেন নাড়ীর যোগ ছিল। এখানে এমন বহু সভা বসেছে যা শুধু বাঙ্গালী জাতীর নয় সারা ভারতেরই ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকার মত। স্যার আশুতোষ, স্যার গুরুদাস থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ মিত্র, কি সেদিনকার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন মিলিয়ে ছিল ঐ পাঁচ ছ'তলা সমান উঁচু ছাদের আলো-অন্ধকারময় রাজত্বে। লর্ড কার্জ্জন এখানে সভা করেছেন, ভারত বাসীকে গাল দিয়ে ব'লেছেন, এশিয়াবাসীগণের সত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আবার ষ্ট্যানলী জাকসনকে লক্ষ ক'রে ছোঁড়া বীণা দাসের গুলির আওয়াজও সেই সঙ্গে মিশে ছিল ঐ প্রোকষ্ঠ গুলির আলো আঁধারে। কোনও অলস মধ্যাহ্নে হঠাৎ যদি আপনি এখানে এসে বঙ্কিমচন্দ্র, রেভারেণ্ড, কৃষ্ণমোহন, রাসবিহারী ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণের বৃহদাকার তৈলচিত্রগুলির দিকে তাকাতেন এবং আচমকা ছাদের কোণে কোণে জমা অন্ধকারের দিকে যদি আপনার নজর পড়ে যেতো তো বাঙ্গলার এই নব্য সংস্কৃতির ইতিহাসের সারা অধ্যায়টা আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। কিন্তু পরক্ষণেই শত শত পায়রার বকম্ বকম্ শব্দে আপনার ঘোর কেটে যেতো। কোনও

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে এমনি কোনও কিছু ভাবতে ভাবতে কারোর ডাকে সম্বিৎ ফিরে ফেলে যেমন লাগে তেমনি অবস্থা হতো আপনার।

সিনেট হলের মত সিনেট হলের এই পায়রাগুলির ইতিহাসও অতি পুরাতন, প্রায় একশো বছরের। ১৮৭২ সালে বাঙলা সরকারের পাবলিক্ ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট ৪,৩২,৬৯৭ টাকা ব্যয়ে এই হলটি নির্মাণ করেন। অর্থাৎ প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে আসল ব্যয় হ'ল অনেক বেশী। ১৮৭৩ সালের ১২ই মার্চ সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে সিনেট হলের উদ্বোধন হোল। তখনকার চ্যান্সেলার ছিলেন লর্ড ব্যারিং, ভাইসচ্যান্সেল্যর এফ সি ব্যায়লী। ১২৬ জন বি. এ, ২৪ জন এম. এ ৭৫ জন, এম, বি, ২৬ জন বি. এল, ছাত্রকে ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিল প্রথম সেদিন এই হলে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌর দাস বসাক, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি সেদিনকার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

কলেজস্ট্রীট দিয়ে যেতে আসতে বহুবার এই অট্টালিকাটি আপনার চোখে পড়েছে। কিন্তু আজ আর সেটিকে দেখা যাবে না কোনও মতেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্দ্ধমান স্থানা-ভাবের জন্য এই ভবনটিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে তৈরী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ী। মানুষ স্বভাবতই রক্ষণশীল। সংগ্রহই তার চরিত্রের প্রথম পরিচয়। তাই মানুষ সহজে কিছু ফেলে না! পুরোন চিঠি, ভাঙ্গা চশমার খাপ, ফ্রেম অবধি জমিয়ে রাখে সযত্নে। সহস্র স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক এই ভবনটি বিশেষ করে যাকে ঘিরে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় এক'শো বছরের ইতিহাস গ'ড়ে উঠেছে, সেটির অবলুপ্তিতে সহজেই হৃদয় চঞ্চল হয় তাই।

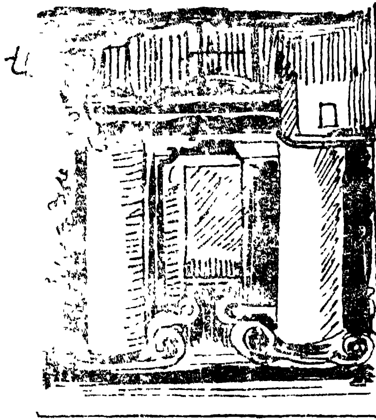
ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়া বেড়ে চলেছে ক্রমেই। বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাত্র সংখ্যাও। অফিসও বাড়ছে সেই অনুপাতে। তাই আবার তাকে ভাবতে হয়েছে নতুন বাড়ীর কথা। ষাটলক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন ভবনটি পরিকল্পনামত তৈরী হচ্ছে তাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনটি সিনেট হাউসকে ভেঙ্গে গড়া হচ্ছে তাই পুরাতনকে বিদায় দিতে স্বভাবতই দুঃখ লাগছে মনে। বিশেষ ক'রে সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিকে কোনও দেশ কখনই তার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে না। আগামী দিনের মানুষদের কথা ভেবে সযত্নে রক্ষা ক'রে তা' জাতীয় সম্পদ হিসাবে।

সিনেট হল নেই, তবু তার ইতিহাস বাঙালী কখনো ভুলবে না।

সংস্কৃত কলেজ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পাতি, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগিশ, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন গুপ্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রামকমল ভট্টাচার্য, রামগতি ন্যায়রত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আরও শত সহস্র ছাত্র সংস্কৃত কলেজের গৌরব। নামের তালিকা পুরোপুরি ছাপতে গেলে হয়ত আলাদা একটা বইতেও কুলোবে না। একশো আটত্রিশ বছর ধরে কলেজটি নীরবে দেশের সেরা সেরা মানুষ গড়ে দিয়েছে।



সংস্কৃত কলেজ

কোথায় যেন পড়েছিলাম, পুত্রেরাই পিতার পরিচয়, ছাত্রেরাই বিদ্যালয়ের। সে পরিচয় সংস্কৃত কলেজের পুরোপুরি ষোল আনাই সার্থক হয়েছে।

১৩৮ বছর আগে ১৮২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত কলেজের পত্তন হ'ল বউবাজারের এক ভাড়াটে বাড়িতে অতি সাধারণভাবে। ১৮২৬ সালের ১লা মে অবধি কলেজ ছিল সেখানেই। তারপর তা উঠে এসেছে নতুন বাড়ীতে।

কলেজের গোড়ায় পাঠ্যবস্তু ছিল মুগ্ধবোধ ও পানিনী ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্র।

প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষপদ ছিল না সংস্কৃত কলেজের, ১৮৫১ সালের জানুয়ারী অবধি। কলেজপ্রধান বা কর্মকর্তাকে বলা হোত সেক্রেটারী। মেজর এ, প্রাইস মাসিক তিনশ টাকা মাহিনার প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন এখানে। তারপর এসেছেন এইচ্ এইচ্ উইলসন্, লেফ্টেন্যাণ্ট এইচ উড, ক্যাপ্টেন এ, ট্রয়ার, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, জে, সি, সি সাদার্ল্যাণ্ড, মেজর জি টি মার্শাল, ডাঃ টি, এ ওয়াইজ, রসময় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি একাধিক সেক্রেটারী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলেই ১৮৫১ সালে প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি হয় এবং ঐ বৎসরই ৪ঠা জানুয়ারী তিনি কলেজের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্থানে আসেন ই, টি, কাওএল। মেজর জি টি মার্শালের আমলেই কলেজের কাজ খুব বেশি হয়ে ওঠায় সহকারী সম্পাদক পদের সৃষ্টি হয় এবং মধুসূদন তর্কালঙ্কার ১৮৩৯ সালে এই পদে নিযুক্ত হন। এ পদে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দ শিরমণি, রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি কাজ করে গিয়েছেন এরপর।

সংস্কৃত কলেজের উন্নতির ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্রের দান অসামান্য। তাঁর সম্পর্কে সেদিনকার শিক্ষাদ গুরের উক্তি, "ঈশ্বরচন্দ্র একদিকে ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত, শুধু তাহাই নহে তাঁহার মত উদ্যমশীল কর্মনিপুণ দৃঢ়চিত্তলোক বাঙ্গালীর মধ্যে দুর্লভ, এ উক্তির সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রমাণ করেছেন তিনি।

১৮২৭ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শ্রেণী খোলা হয়, কিন্তু নানাকারণে আট বছরের বেশী তা থাকেনি। ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে সেই ইংরাজী শ্রেণীগুলির পুনঃস্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না তবুও। এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ফলে ১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরই চেষ্টায় ইংরাজী শ্রেণীগুলির সংস্কার হয় এবং সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রণালী অবলম্বনের দ্বারা শ্রেণীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলে।

১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল অবধি এই শতাধিক বৎসর কলেজের উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। মধ্যে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে এ কলেজের আর্টস বিভাগের ছাত্রগণ সংস্কৃত, প্রাচীন ভারতীয় এবং বিশ্ব ইতিহাস ছাড়া আর সব পড়েছে প্রেসিডেন্সী কলেজে। কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল এতদিন নব্বুই। হালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে একশ ত্রিশ। ১৩০টি ছাত্রের মধ্যে কলেজের ইংরাজী বিভাগে ২৫টি এবং টোল বিভাগে ২৯টি বৃত্তির বন্দোবস্ত রয়েছে।

কলেজের টোল বিভাগ এর একটি প্রাচীন গৌরব। এখানে প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের পঠন পাঠন হয়ে থাকে। এখানে বেদ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায় ও সাধারণ দর্শন, নব্যন্যায়, সাংখ্যযোগ, বেদান্ত, জ্যোতিষ ও স্মৃতিতে যথাক্রমে এগারো, ষোল, বার, দশ, সাত, পাঁচ, আট ও পনের জন ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

সংস্কৃত পড়ার আগ্রহ আজ বিদেশেও দেখা দিচ্ছে। তাদের জন্য এ কলেজে একটি বিশেষ শ্রেণী রয়েছে। ১৯৫৯ সালে

এখানে ৪ জন বৃটিশ, ২ জন জার্মান, ১ জন ডাচ্, ১ জন আমেরিকান, ১ জন চৈনিক এবং অন্য ১ জন সহ ১৪ জন বিদেশী ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীতে পড়ান।

সংস্কৃত কলেজের অন্যতম আকর্ষণ এর গ্রন্থাগার। গত একশ পঁচিশ বছর ধরে বড় হয়েছে এই গ্রন্থাগারের ভাণ্ডার, নানা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহে। এখানকার সংরক্ষিত মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ত্রিশ হাজার এবং হস্ত লিখিত পুঁথির সংখ্যা পাঁচ হাজার পাঁচশ। সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ছ'শ। গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রথম গ্রন্থাগারিক, তিনি মাসিক যাট টাকা বেতনে ১১ই জানুয়ারী ১৮২৪ সালে কাজে যোগ দিলেন। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করেছেন একাধিক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, মাধব রাও, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, নীলমাধব শর্মা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্করত্ন, জগন্মোহন শর্মা প্রভৃতি। ১৯৫৮ সালের হিসাবে গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে, ঋণ বিভাগে ৪,৩১৫ এবং ঈক্ষণ বিভাগে ৩৪,৭৩১ খানি। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি রয়েছে। এগুলির যথোপযুক্ত প্রচার ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে শ্রীনরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ ও শ্রীউপেন্দ্রমোহন সাংখ্যতীর্থ এগুলির বিবরনাত্মক সূচী তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন সরকারী তাগিদে।

১৯৫৮ সালের হিসাবে দেখি কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন অধ্যক্ষ ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রী ডি, এম, ভট্টাচার্য্য, ডাঃ আর, সি, হাজরা, পণ্ডিত অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য,

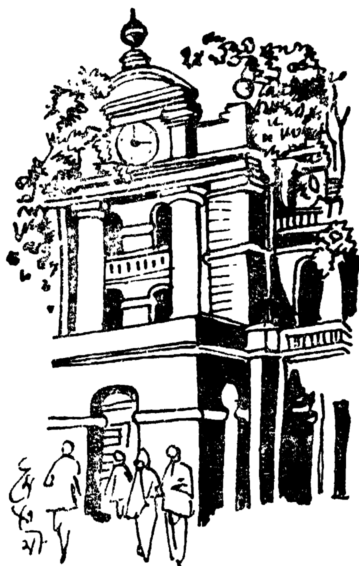
ন্যায় তর্কতীর্থ, শ্রী এস, সি, ভট্টাচার্য্য, শ্রী কে, সি শাস্ত্রী, ডাঃ সি, সি, দাশগুপ্ত, ডাঃ জি, সি, মুখোপাধ্যায়, ডাঃ এস, কে মিত্র, শ্রী এইচ, এন, চ্যাটার্জী, শ্রী বি, সি, মুখার্জী, শ্রী কে, ডি, ভট্টাচার্য্য, শ্রী বি, কে মতিলাল, টোল বিভাগে পণ্ডিত মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতি তীর্থ, পণ্ডিত তরণীকান্ত স্মৃতিতীর্থ, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য, পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, পণ্ডিত পিতাম্বর ঝা, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এম, মুখার্জী প্রভৃতি।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের আমন্ত্রণে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র-অধ্যাপকবৃন্দ কালিদাস সমারোহ-উৎসব উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে শকুন্তলা নাটক অভিনয় করে সমবেত সুধিজনের অজস্র প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছেন, প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ অভিনয় দেখে এতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেবার মালয় যাবার পথে কোলকাতায় এসে তিনি এই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিমন্ত্রণ করে পাঠান রাজভবনে। বাঙ্গালীদের সংস্কৃত উচ্চারণের ত্রুটি আছে একথা বলে সারা ভারত। সংস্কৃত কলেজের অভিনয় দেখে সকলেই কিন্তু এক বাক্যে স্বীকার করেছেন এঁদের উচ্চারণ অপূর্ব্ব। দীর্ঘ ১৩৮ বছরের কলেজের সুনাম আজও তাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন দেখে সারা বাঙলাদেশও খুসী হবে।

———

হিন্দু কলেজ-প্রেসিডেন্সি কলেজ

হিন্দু কলেজের পত্তন হোল—২০শে জানুয়ারী, ১৮১৭ সালে, গোরাচাঁদ বসাকের ৩০৪, চিৎপুর রোডের বাড়ীতে। তিনশ টাকা মাইনের ফ্রান্সিস আর্ভিন (লেফটানেণ্ট) ইউরোপিয়ান সেক্রেটারী, একশো টাকা মাইনের বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী নেটিভ্ সেক্রেটারী, দু'শ টাকা মাইনের হেড্মাষ্টার চন্দন নগরের জেমস্ আইজাক দ্য আসলামকে নিয়োগ করলেন স্যর ই, এইচ্, ইষ্ট, ১৮৫৬ সালে ৪ঠা ডিসেম্বরের মিটিংএ। মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন পাঁচ-জন মেম্বর। গঙ্গানারায়ণ দাস, রাধামাধব ব্যানার্জী, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গোপীমোহন দেব প্রভৃতি। অকুণ্ঠ ভাবে অর্থ সাহায্য করলেন বর্দ্ধমানের মহারাজা। খবর পাওয়া যায় পাথুরিয়া ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর পরিবার ১০,০০০ ও বড় বাজারের মল্লিকেরাও ২৫,০০০ টাকা দিয়েছেন তখন। মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ ও গোপীমোহন ঠাকুর হলেন নবগঠিত হিন্দু কলেজের গভর্ণর। কলেজের দুইভাগ। স্কুল আর আকাদেমী, পাঠশালা আর মহা পাঠশালা। পাঠ্যবস্তু, ইংরেজী ও বাঙলাভাষা এবং সাহিত্য,



প্রেসিডেন্সী কলেজ

পারসীয়ান, ইংরাজী ব্যাকরণ, হাতের লেখা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র, ইংরাজী বেলে লেটার্স, কবিতা-সংগ্রহ ইত্যাদি। রামমোহন রায়, ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি এগিয়ে এলেন কলেজকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কোনও এক অজানা কবি পদ্য রচনা করলেন কলেজকে ব্যঙ্গ করে, "খানাকুলের বামুন একটা করেছে স্কুল, জাতের দফা হ'ল রফা থাকবে নাকো কূল।" খানাকুলের এই ব্রাহ্মণ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যাঁর জন্ম হয়েছিল রাধানগরে, হুগলীজেলার কৃষ্ণনগরের খানাকুলের কাছে।

হিন্দু কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল কুড়ি, খোলবার দিনে। তিন মাসের মধ্যে তা' বেড়ে হ'ল উনসত্তর। ১৮৩৯ সালের ইতিহাসে দেখছি কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা আঠারো। ছাত্রের সংখ্যা ৫৩৯ এবং ৩৭২ যথাক্রমে মহাপাঠশালা এবং পাঠশালায়, সিনিয়র ও জুনিয়র স্কুলে। তখনকার মাসিক খরচা দু'হাজার একুশ টাকা। কলেজের ইতিহাসে একাধিক ঘটনা স্মরণীয়। ১৮২৮ সালে এইচ, এল, ভি ডিরোজীওর ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে যোগদান, ১৮২৪ সালে সোডা সাহেবের (ডি, রস) তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান ক্লাসের পত্তন, ১৮৩৫ সালে ক্যাপ্টেন ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসনের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় যোগদান, ১৮৪২ সালে প্রিন্সিপ্যাল পদ সৃষ্টি ইত্যাদি। "সোডা সাহেব" ছিল ডি, রসের ছাত্র প্রদত্ত নাম। বিজ্ঞানের ক্লাসে তিনি 'সোডা' নামক পদার্থটির এত অধিক উল্লেখ করতেন যে ছাত্ররা তাঁকে এই নামে ডাকতো। ১৮৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল হিন্দু কলেজের শেষ, ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন প্রেসিডেন্সী কলেজের সুরু। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী

কলেজকে দিল গৃহ, বিজ্ঞানাগার, ছাত্র-অধ্যাপক সহ সাত হাজার বইএর এক পাঠাগার, আর সবচেয়ে বড় যা দিল তা হোল এক মহাজাগরণের আভাষ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজ পেল একাধিক কৃতি বঙ্গ সন্তানের তৈরী এক ট্রাডিশন। একাধিক মনিষী প্রাক্তন ছাত্রের এক তালিকা। সে তালিকায় আছেন, রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের পুত্র), অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রামগোপাল ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারিচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, (তরু দত্তের পিতা), শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচন্দ্র মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি।

এই দিনটি থেকে কলেজ পুরোপুরি সরকারী আওতায় এলো।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করলেন, এন্ট্রান্স, বি. এ এবং অনার্স পরীক্ষা নেওয়া হবে। এম. এ ক্লাসে ছাত্র ভর্ত্তি করার জন্য প্রথম কলেজ যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেল তা হোল প্রেসিডেন্সী। রেকর্ডে দেখা যায় ১৮৫৭ সালে ২৩ জন ছাত্র এখান থেকে বি. এ পরীক্ষা দিতে যায় এবং ২২ জন পাশ করে। এই বাইশ জনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমাধব ঘোষও আছেন।

১৮৫৭ সালে ১৭ জন ছেলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ব'সে এবং ১২ জন পাশ করে। ১৮৬৩ সালে এই কলেজ থেকেই ৬ জন ছাত্র প্রথম এম- এ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন।

এরপর কলেজ সাফল্যের পথে এগিয়ে গেছে ধীরে ধীরে। হাজার হাজার ছাত্র পাশ ক'রে বেরিয়ে গেছে ক্রমশঃ, যেমন দ্বারকানাথ মিত্র, গুরুপ্রসাদ সেন, প্রমদাচরণ ব্যানার্জী, বিপিনকৃষ্ণ বোস, হেমচন্দ্র ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু (ভারতীয় র‍্যাংলার), গৌরীশঙ্কর দে, চন্দ্রনাথ বসু, ঈশানচন্দ্র বসু, রজনীনাথ রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত। বিহারীচরণ মিত্র, প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, আশুতোষ মুখার্জী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, প্রিয়নাথ সেন, বরদাচরণ মিত্র, মাধবচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ গুপ্ত, সূর্য্যকুমার অগস্তি, রমেশচন্দ্র মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক্, অক্ষয়কুমার মৈত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজশেখর বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম, যা মনে পড়েছে এই মুহূর্তে তাই লিখছি। আরও বহু নাম নিশ্চয়ই বাদ পড়েছে তালিকা থেকে।

১৮৯৭ সাল থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে সহ-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। প্রথম ছাত্র হিসাবে কলেজে যোগদান করেন অমিয় রায় এবং চারুলতা রায়। উভয়েই ভর্ত্তি হন ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে। এটিও কলেজের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শিক্ষকের নামের তালিকা অতি দীর্ঘ। কেবলমাত্র যে

কয়েকজনের নাম না করলেই নয় এবং এখুনি মনে পড়ছে তাদের কথাই বলি। ডিরোজিও, রিচার্ডসন, পেড্‌লার, ক্রফ্‌ট্‌, কাওএল, সাটক্লিফ্‌, পারসিভাল প্রভৃতি বিদেশীদের নাম সর্বাগ্রে করি যাঁরা এদেশীয় মানুষগুলিকে দেখেছেন অতি সহানুভূতির চোখে। যে দৃষ্টিতে ছাত্রের প্রতি স্নেহ ছিল অধিক, ছিল না শাসিতের প্রতি শাসকের করুণামিশ্রিত দান। দেশী অধ্যাপকদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, বিপিনবিহারী গুপ্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মনমোহন ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, কেদারনাথ দাস, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ দে, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রয়েছেন। এ ছাড়াও মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, আশুতোষ শাস্ত্রী, সদানন্দ ভাদুড়ী, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভুদত্ত শাস্ত্রী, চন্দ্রমাধব ঘোষ, সৈয়দ আমির আলি, বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মৈত্র, সারদাপ্রসন্ন দাস, রাখালদাস চক্রবর্ত্তী, জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

আজকের প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রায় সব রকম বিষয়েই পড়াবার বন্দোবস্ত রয়েছে। ইংরাজী বাঙলা সাহিত্য, হিন্দী, পারসীয়ান, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি সবই। আজকের অধ্যাপকের তালিকাও অতি দীর্ঘই।

১৯৫৯ সালের প্রথমে কলেজের ছাত্র সংখ্যা কিঞ্চিদধিক বারো'শ পঞ্চাশ, দু'শ পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রীসহ কলেজের মোট ছাত্রী সংখ্যা দু'শর কাছাকাছি।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ

এক ডাক্তার বন্ধুর ডিসপেনসারিতে সেদিন বসেছিলাম। টি-বি রোগী এসেছে একটি। পরীক্ষা করে ওষুধ এবং পথ্যের বন্দোবস্ত করা গেল। ডাক্তার বন্ধু বললেন, সাবধানসে রহো। পশ্চিমা রোগী ঘাড় নেড়ে চলে গেল। দিন দশ-বারো বাদে একদিন সন্ধ্যায় সেই ডাক্তারবন্ধুর ডিসপেনসারিতেই রোগীটিকে আবার দেখলাম আসতে। শরীর হয়েছে দুর্বল, ক্ষীণকায়। যেন মৃত্যুপথযাত্রী দিন গুনছে এমনি চেহারা হয়েছে তার। ডাক্তার রোগীর হাল দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেলেন, মনে হল। জিজ্ঞাসা করলেন, "ওষুধ ঠিকমত খাচ্ছ ত ?" উত্তর হল, "হ্যাঁ।" "খাবার-দাবার কী কী খাচ্ছ ?" "কেন সাবু-দানা



মেডিকেল কলেজ

আপনি যা খেতে বলেছিলেন, তেমনি।" সাবু-দানা—টি-বি রোগীর জন্য সাবু-দানা! বলে কী! ডাক্তারের ত আকাশ

থেকে পড়বার মত অবস্থা। পরে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, ডাক্তার যে তাকে 'সাবধান সে রহো' বলেছেন, তাই সে শুনেছে 'সাবুদানা সে রহো' এবং সাবু-দানা খেয়ে দশ-বারো দিনে প্রায় মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। সাধারণ জ্বর-জ্বারি হলে সাবু খেয়েই যে থাকতে হয় এ আর কে না জানে! অতএব ডাক্তার যে তাকে সাবু-দানা খেতে বলেছেন এতে আর সন্দেহ কী!

এমনি দেশে প্রথম যে-গুটিকয় মানুষকে ইউরোপীয় প্রথায় চিকিৎসা-বিদ্যা শেখাবার জন্য মেডিকেল কলেজ চালু করতে হয়েছিল তাদের সাহসের প্রশংসা করতেই হবে। সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস ছিল অবশ্য আগে থাকতেই, তবু সকলেই বুঝলেন পুরোপুরি ইউরোপীয় প্রথায় চিকিৎসাবিদ্যা শেখাবার একটা স্কুল এখুনি খোলা দরকার। ১৮৩৫ সনের ২৮শে জানুয়ারি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক আইন পাস করলেন এই সম্পর্কে। ঠিক হল, পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীকে মাসিক সাত টাকা থেকে বারো টাকা ভাতা দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখানো হবে এবং শিক্ষা শেষে দেওয়া হবে চাকরি, মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনের এবং একটি সার্টিফিকেট। হিন্দু কলেজের সংলগ্ন পেটিকোর্ট-জেলের বাড়িটিতে বসল প্রথম মেডিকেল স্কুল। জংলা লতাপাতা, ভেষজ, আয়ুর্বেদ, হেকিমি, তামা-তুলসী-মাদুলি-মন্ত্র-জলপড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতীয় চিকিৎসা-জগতে নতুন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত "নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন-এর বৈদ্য, এলেন নতুন কলেজ। এ জে ব্র্যামলে চাকরি পেলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মাসিক বারো শ টাকায়। এইচ এইচ গুডিভ তার সহকারী, মাসিক ৬০০৲ টাকায়। ১৮৩৫ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি খুলল স্কুল। নেই ঢাল, নেই

তলোয়ার। না হাসপাতাল, না লাইব্রেরি, না মিউজিয়ম। তবু ওই নিয়েই পত্তন করতে হল। ১৫০০ টাকা ব্যয়ে বাথগেট অ্যাণ্ড কোম্পানি দুটি কঙ্কাল এনে দিলেন স্কুলে। অতি সাধারণ-ভাবে মিউজিয়ম বসল মিস্টার ইভান্স কিউরেটরকে নিয়ে।

ইতিহাসই তৈরি করলেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। ১০ই জানুয়ারি, ১৮৩৬ সন, চারিটি ছেলে সমেত অধ্যাপক গুডিভের সঙ্গে গোপনে মেডিকেল কলেজের এক নিভৃত গৃহে তিনি নিজ হাতে একটি মড়ার উপর কাটাকুটি শুরু করলেন। পণ্ডিত গুপ্তর সঙ্গে ছিলেন উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও আরও একজন। সমাজের সে-অবস্থায় এ-জাতীয় কাজ যে কতদূর কষ্টসাধ্য তা আজ বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাই বলছিলাম ইতিহাস রচনা করলেন এঁরা।

ব্রামলে ১৮৩৭ সনের ১৯শে জানুয়ারি মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হেয়ার সাহেব এলেন কলেজের সেক্রেটারী হয়ে। এই সময় কলেজের শিক্ষকসংখ্যাও বর্ধিত হল। হেনরি গুডিভ গেলেন অ্যানাটমি এবং মেডিসিনে, ডবলু বি ওসাংনেসি রসায়নাগার ও মেটিরিয়া মেডিকায়, সি সি এগারটোন সার্জারী ও ক্লিনিক্যাল সার্জারীতে, জে ম্যাককস ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে, এন ওয়ালিয়ে বোটানিতে।

১৮৩৮ সনের ১লা এপ্রিল ২০টি বেড নিয়ে খোলা হল প্রথম হাসপাতাল। অবশ্য কলকাতায় এর আগেও হাসপাতাল ছিল না এমনটি নয়। সেণ্ট জনস চার্চের কাছে কবরখানার পাশাপাশি একটা হাসপাতাল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিল ১৭০৭ সনের অক্টোবরে। ১৭৬৮ সনে লোয়ার সারকুলার রোডে প্রেসিডেন্সী জেলের দক্ষিণে একখণ্ড

জমিসহ বাড়ি ক্রয় করেন সরকার এবং এখানেই পত্তন হয় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালের। ১৭৫৬ সনে সিরাজের কলকাতা অবরোধ এবং প্রধানত সেই যুদ্ধে আহত সিপাহীদের চিকিৎসার জন্যই এ হাসপাতালের জন্ম। ১৭৮৭ সনের দমদমের টিকা-হাসপাতাল এবং ১৮১৪ সনের ১২ই জুন প্রতিষ্ঠিত পার্ক ষ্ট্রীটের 'লাইয়িং-ইন' হাসপাতালও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবু কলকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালকেই সঠিকভাবে বলতে গেলে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল বলা উচিত। এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করা হল বহির্বিভাগ। লর্ড অকল্যাণ্ড এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ১৮৩৯ সনের রিপোর্টে দেখছি, প্রতিদিনই গড়ে ২০০ রোগী এখানকার বহির্বিভাগে দেখা হয়েছে।

এই সময়ই মেডিকেল কলেজের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা, এমন কি সিংহল থেকেও কয়েকজন ছাত্র পড়তে আসেন।

১৮৩৮ সনে ৩০শে অক্টোবর প্রথম পরীক্ষা বসল এখানে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পড়ার পর। এই কয়জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে বসলেন—উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, কালাচাঁদ দে, গোপালচন্দ্র গুপ্ত, চিমনলাল, নবীনচন্দ্র মিত্র, নবীনচন্দ্র মুখার্জি, জেমস পোর্ট, বদনচন্দ্র চৌধুরী ও শ্যামচন্দ্র দত্ত। পরীক্ষা নিলেন ডাঃ নিকলসন, গ্রাণ্ট, মার্টিন ষ্টুয়ার্ট, গুডইভ, হ্যালিডে প্রভৃতি নাম-করা সার্জন এবং ডাক্তারেরা। কঠিন পরীক্ষায় পাস করলেন পাঁচজন—উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে, নবীনচন্দ্র মিত্র ও শ্যামচন্দ্র দত্ত।

পরে আরও এক ইতিহাস তৈরি করলেন মেডিকেল কলেজের পাস করা আর চারজন। ১৮৪৫ সনে ১৮ই মার্চ "বেন্টিঙ্ক" জাহাজে তাঁরা চললেন বিদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় আরও অধিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে অধ্যাপক গুডিভ এবং বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর—দেশের শিক্ষা বৃদ্ধির সহায়তায় যাঁর তুলনা নেই। এই চারজন হলেন ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু, এবং সূর্যকুমার চক্রবর্তী।

ইতিমধ্যে ১৮৪০ সনে মেয়েদের চিকিৎসার জন্য ১০০ বেডের একটি হাসপাতালের পত্তন হয়েছে এখানে, প্রায় সবই জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানে। কলকাতা শহরের চারদিকে এবং মফস্বলে ডিসপেনসারী খোলা শুরু হয়েছে। সাড়ে তিন বছরের কোর্স বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে।

১৮৪৭ সনের নভেম্বরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ফাইন্যাল এম-বি পাস করলেন বি, এন, বোস, ডি, এন বোস এবং জি, সি, শীল অতি সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বিভাগে। বি, এন, বোস এম-ডি হয়ে ফিরে এলেন। ডাঃ চক্রবর্তী ১৮৪৮ সনে এম-আর-সি-এস এবং এম-বি ও পরে এম-ডি হন ১৮৪৯ সনে।

মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন সবচেয়ে বড় হাসপাতাল স্থাপিত হল ১৮৫২-৫৩ সনে। ৩৫০টি শয্যার হাসপাতাল, যার একশ থাকবে ইউরোপীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত, বাকী ২৫০ ভারতীয়দের এরই মধ্যে ১১৬টি শিশু ও স্ত্রী-রোগীদের জন্য। ১৮৫২ সনের ১লা মার্চ জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল এর দরজা।

কলেজে এই সময় অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, জুলজি, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, মেটিরিয়া মেডিকা, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স, মিডওয়াইভারি, সার্জারি, মেডিসিন এবং অপথ্যালমিক সার্জারি

বা চক্ষুরোগ সম্পর্কে পড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছে। কলেজের রেকর্ডে দেখা যায়, এই বছর ৯০০টি শবদেহ নিয়ে কাটাকাটি করে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে সাত শ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে এসেছে মেডিকেল কলেজ।

এর পরের মেডিকেল কলেজের ইতিহাস ক্রমেই এগিয়ে গিয়েছে সাফল্য থেকে সাফল্যের পথে। মেসমেরিজম বা সম্মোহনী বিদ্যার সাহায্যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়ে ডাঃ জেমস এসডেল অপারেশন করেছেন একদা, আর আজ! এই সাফল্যই তার ইতিহাস। মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস। রোগের পায়ে বেড়ি পরাবার প্রচেষ্টার গৌরবজনক অধ্যায়। এই ইতিহাসকে রচনা করেছেন ব্রাম্‌লে, হেয়ার, গুডিভ, মোয়াট, ইটওয়েল, শেভার, স্মিথ, কোট্‌স, বার্চ, বম্‌ফোর্ড, লুকিস, ডুরি, ক্যালভার্ট, ডিয়ারে, বার্নাডো স্টিউয়ার্ট, গয়েল, বয়েড প্রভৃতি একাধিক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের সুদক্ষ পরিচালনায়। সেই ইতিহাসের জয়যাত্রার স্তম্ভস্বরূপ তৈরি হয়েছে এক-একজন ছাত্র। সার নীলরতন সরকার, কর্নেল সার ফ্রাঙ্ক পি কোনার,সার কেদারনাথ দাস, সার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, লেঃ কর্নেল সার হেনরি গিডনি, রায় সূর্যকুমার সর্বাধিকারী বাহাদুর, মহেন্দ্রলাল সরকার, লেঃ কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

১৮৫৭ থেকে ১৯৫৭ অবধি দীর্ঘপথ। ১৯৫৮ সনের ২৮শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত কলেজের বার্ষিক রিপোর্টে দেখেছি, ছাত্রসংখ্যা ১০৪৪। তার মধ্যে ১১৬ জন ছাত্রী। ১৮৭৬ সনে লেফটানেণ্ট গভর্নর সার রিচার্ড টেম্পলের আগ্রহাতিশয্যে যেদিন

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এখানে ছাত্রী গ্রহণ করা হবে, সে কি কিছু কম উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ১৮৮৪ সনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম এলেন এখানে। প্রথম মহিলা ছাত্রী যাঁরা গ্রাজুয়েট হয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীমতী বিধুমুখী বসু ও মিস ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। ১৮৮৯ সনে। সেই একজন আজ একশ ষোল জন হয়ে দেখা দিয়েছেন।

আর্তের সেবা মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেই কাজে সারা জীবন একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করবার ব্রত নিয়ে এঁরা বড় হচ্ছেন। এঁরা কেউ যাবেন গ্রামে, কেউ থাকবেন শহরে। রাত্রের ঘুম এঁদের ব্যাহত হবে প্রতিদিন। রোগীর পাশে কাটবে একাধিক বিনিদ্র রাত। ক্লান্তি নামবে শরীরে, কিন্তু মন থাকবে অবিচলিত। পৃথিবীর সব যুদ্ধের ইতিহাসের চেয়েও বড় এক যুদ্ধের এঁরা সৈনিক। সে-যুদ্ধ জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের।

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন

বাঙলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে যে কয়েকটি ব্যক্তির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ব্রাহ্মবন্ধুসভার পত্তন হয়। সভার পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীহরলাল রায় বলেন, 'ঈশ্বরপ্রসাদে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি উপায় কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুসভা অবলম্বন করিয়াছেন, এই উপায় হোল বাড়ীতে বসে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা, নিয়মিত পরীক্ষা ও পুরস্কার ইত্যাদি প্রদান। এর পর স্ত্রীশিক্ষার কাজ



ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন

বামাবোধিনী সভার হাতে আসে। কেশবচন্দ্র এই সময়েই ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তারিখ ১লা

ফেব্রুয়ারী। স্কুলের নাম—ফিমেল নর্মাল এণ্ড এ্যাডাল্ট স্কুল। বামাবোধিনী পত্রিকার মার্চ (১৮৭১) সংখ্যায় মন্তব্য করা হয় : ভারত সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রীসংখ্যা ১৭টি হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙলা শিক্ষা দেন এবং একটি বিবি (ইনি মিসেস নিকলসন) ইংরাজী ও শিল্পকার্য শেখান। ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। প্রথম বছর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যাঁর কথা আগেই বলেছি। বামাবোধিনী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের হিসাব, ষাণ্মাষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং পারিতোষিকপ্রাপ্ত ছাত্রীদের নাম পাওয়া যায়। ১ম শ্রেণী—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন, কুমারী সৌদামিনী কাস্তগিরী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী। ২য় শ্রেণী—শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী, জগন্মোহিনী রায়, জগত্তারিণী বসু, সারদাসুন্দরী ঘোষ, কুমারী সরলা বসু। ৩য় শ্রেণী—শ্রীমতী মনমোহিনী সেন, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, বসন্তকুমারী মৈত্র। ৬ই এপ্রিল, ১৮৭২ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের দিনের একটি সুন্দর ছবি পেয়েছি একটি পুস্তিকায়। পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে—লেডি নেপিয়ার পারিতোষিক বিতরণ সভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রায় ষাটটি মহিলা উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণাদিতে সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত। ইঁহাদিগের মধ্যে সকলেই ব্রাহ্মিকা ছিলেন তাহা নহে, কতিপয় হিন্দু মহিলাও তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। বিবাহিতা, অবিবাহিতা, নববিবাহিতা সকলপ্রকার মহিলা সভার শোভাবর্ধন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে লেডি নেপিয়ার, লেডি

টেম্পল, মিস মিলম্যান, মিস্ট্রেস উড্রো, মিস্ট্রেস মিচেল, মিস পিগর্ট এবং আরো অনেকে উপস্থিত হন। লেডি নেপিয়ার স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সভাস্থলে উপস্থিত নারীগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্থির, শান্ত, গম্ভীর ও ভদ্রভাবে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের উপরে সুশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অদ্যকার সমুদয় ব্যাপারে কি প্রকার আহ্লাদিত হইয়াছেন, লেডি নেপিয়ার সে বিষয়ে উপস্থিত মহিলাগণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করাতে, কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষায় রাজপ্রতিনিধি-পত্নীর আহ্লাদের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। সভাভঙ্গকালে উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজপ্রতিনিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।'

ফিমেল নর্মাল স্কুল প্রথম মির্জাপুর ষ্ট্রীটে শুরু হয়। ১৮৭২-এ তা বেলঘরিয়ায় উঠে আসে। তিন মাস এখানে থাকার পর বিদ্যালয় যায় মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছির বাগান-বাড়ীতে। বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে প্রায় একশো আশি টাকার মত, কেশবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির দানেই চলতো।

ছাত্রীদের পুস্তকের তালিকায় ছিল বাল্মীকি রামায়ণ, নারী-জাতি বিষয়ক প্রস্তাব, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান, অলঙ্কারশাস্ত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও শরীরবিদ্যা। ইংরেজীর মধ্যে পি সি সরকারের ফিফথ বুক অব রিডিং, একখানা গ্রামার প্রভৃতি।

এর পর বিদ্যালয়টির কাজ ক্রমেই বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ছাত্রীসংখ্যাও। শিক্ষক হিসাবে আসেন মিসেস উইনস,

শশিভূষণ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগমায়া চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী সেন, রাধারাণী লাহিড়ী, মহেন্দ্রনাথ বসু, গৌরগোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার সেন, গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেকেই।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্যালয়টির নাম হয় ভিক্টোরিয়া কলেজ। কলেজের প্রথম পারিতোষিক বিতরণ হয় ১৮৮৩ সালের ৯ই মার্চ কলিকাতার লর্ড বিশপের পৌরহিত্যে। ১৯৩২ সাল অবধি শুধু আই এ পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে এখানে। ১৯৩৫ সাল থেকে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে পরিগণিত হল। বি এ অনার্স খোলা হল প্রায় সব বিষয়ে। ১৯৫০ সালে খোলা হল আই এস-সি।

ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের বর্তমানে দুই ভাগ—উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ। এর গভর্নিং বডিতে রয়েছেন—মহারাণী সুচারু দেবী, জাষ্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রদ্ধেয় ডি, এম, সেন, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী, সর্বশ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ, লীলা মজুমদার, লেফ্‌ট্যনেণ্ট কর্ণেল কে কে, চ্যাটার্জি, সুবিমল চ্যাটার্জি, এস সি রায় বার-এট-ল, ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, পি, সি, মিত্র, শ্রীমতী সুপ্রভা চৌধুরী (অধ্যক্ষ) প্রভৃতি। অধ্যাপনায় আছেন—শ্রীমতী এস চৌধুরী এচ, বি, মণ্ডল, কে, কে, মুখার্জি, কুমারী লক্ষ্মী বোস, স্নিগ্ধা দাসগুপ্ত, ডাঃ সতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মুন্সী, কুমারী বিন্দুবাসিনী দেব, মমতা অধিকারী, শোভা ঘোষ, মঞ্জু বোস, সর্বশ্রী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, পি ঘোষ, মমতা দাশগুপ্ত, কল্পনা বিষয়ী, দুর্গা ব্যানার্জি, অপর্ণা সরকার, শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্তী, অতিন্দ্রেয় বোস, কুমারী

কৃষ্ণকলি ঘোষ, শ্রীরামরঞ্জন সিং, শ্রীসুধীনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, রাসবিহারী বোস, শ্রীঅখিলচন্দ্র চন্দ, শ্রীমতী অণিমা দেবী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, কুমারী বাণী চৌধুরী, শ্রীমতী নমিতা সাহা, কমলিনী রায়, কুমারী সুপ্রীতি চক্রবর্তী। লাইব্রেরিয়ান শ্রীচঞ্চলকুমার বসু।

স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে এর ছাত্রীসংখ্যা ১৯৫৯এর হিসাবে প্রায় ১৮০০। ক্লাস ওয়ান থেকে বি এ অনার্স অবধি পড়ানো হয় এখানে। প্রাক্তন ছাত্রীদের তালিকায় রেণু চক্রবর্তী এম, পি, ডাক্তার বাসনা সেন প্রভৃতি একাধিক কৃতী মহিলা রয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার্থে প্রতি সপ্তাহেই নানাধরণের শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনার বন্দোবস্ত হয় এখানে। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্রের শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করছেন কলেজ-কর্তৃপক্ষ।

——

জেনারেল এ্যাসেম্বলী-ডাফ-স্কটিশ চার্চ কলেজ

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের কলেজ এই স্কটিশচার্চ। একাধিক কৃতী বঙ্গসন্তানের জ্ঞানলাভ হয়েছে এখানে।

১৮৩০ সালের আগষ্ট মাসে রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ এই কলেজ স্থাপনা করলেন। নাম দিলেন জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে যে কয়েকটি বিদেশীর নাম সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন তার মধ্যে কেরী, মার্সম্যান, হেয়ার, বেথুন, কার্পেণ্টার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের নামও উল্লেখ করতে হবে।



ডাফ কলেজ

দেশীয়গণের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্যই তিনি পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন স্থাপনার ব্যাপারে। বর্তমান কলেজভবনটি ১৮৩৭ সালের। ১৮৪৩ সালে স্কটল্যাণ্ড চার্চে মিশনারীদের মধ্যে বিভেদের ফলে আলেকজাণ্ডার ডাফকে জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ পরিত্যাগ করতে হয়। ডাফের প্রতিভা বিশেষ করে তাঁর সংগঠন শক্তি এতে

মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি। তিনি নতুন উদ্যমে চাঁদা আদায় করতে থাকেন। দেশীয় রাজা-রাজড়া এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অকুণ্ঠদানে সম্ভব হয় আর একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠা, যার নাম হোল ডাফ কলেজ—শ্রদ্ধেয় আলেকজাণ্ডার ডাফের মৃত্যুর পর। ১৯০৮ সাল অবধি জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন ও ডাফ কলেজ পাশাপাশি কাজ করতে থাকে।

এবং এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ১লা জুন থেকে দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একটি একক প্রতিষ্ঠানের, যার নাম হবে স্কটিশচার্চেস কলেজ। ১৯২৯ সাল অবধি কলেজটির নাম ছিল স্কটিশ চার্চেস কলেজ, ১৯৩০এ অর্থাৎ যখন প্রতিষ্ঠানটির বয়স একশো বছর পূর্ণ হয়েছে তখন থেকে এর নাম হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ, কারণ ইতোমধ্যে স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন চার্চের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভবপর হয়েছে। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ ও আরও নানা সম্প্রসারণ হয় ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ এই ১৯২১ সালেই। ডাফের মূল বাড়ীটি এখন কলেজের ল্যাবরেটারী হিসাবে কাজ করছে। ১নং কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে কলেজের বি টি বিভাগটি খোলা হয়েছে।

শতাধিক বৎসরের গৌরবময় ইতিহাসে কলেজের একাধিক বিশিষ্ট অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের দান রয়েছে। এমন বহুজন এঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষাই যাঁরা জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি মিশনারী শিক্ষক কয়েকজনকে, স্কটিশচার্চ নয় বাংলা দেশের অপর একটি বিশিষ্ট মিশনারী কলেজে। ছাত্রকে এঁরা যেন বন্ধুর মতো নিয়েছেন। কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন খেলার মাঠে, পার্টিতে, পিকনিকে, সিনেমাগমনে, এমন কি গান-বাজনার আসরেও।

বিতর্ক সভায় দেখা পাওয়া গেছে তাঁর, ষ্টাডি-টুরে তিনিই হয়তো হোলড-অল বাঁধতে সাহায্য করছেন কোনও ছাত্রকে। এই প্রকার মূল্যবান সাহায্য অনেক ছাত্রের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে দেখেছি। কলেজ-জীবনের একটি দিন মনে পড়ে। ফুটবল খেলার মাঠে একটি ছেলের পায়ে চোট লেগেছে। প্রিন্সিপ্যাল তাকে কোলে করে তুলে আনলেন নিজের ঘরে। ডাক্তার ডাকলেন, ওষুধ দিলেন, পথ্য দিলেন। হষ্টেলের



স্কটিশচার্চ কলেজ

ছেলে, তার শোবার ব্যবস্থা হল প্রিন্সিপ্যালের পাশের ঘরে। তার কাছে শুনেছি, গভীররাত্রে পায়ের যন্ত্রণায় যখন সে ছটফট করছে তখন কপালে যাঁর স্নেহশীতল হাতের স্পর্শ পেয়েছে সে, সে হাত প্রিন্সিপ্যালের।

ডাফ ছাড়া একাধিক অধ্যক্ষ এসেছেন এখানে। জেনারেল এ্যাসেম্বলীজে, ডাফে ও স্কটিশে। রেভারেণ্ড জেমস অগিল্‌ভি, রেভারেণ্ড ডবলিউ, সি, ফাইফ, রেভারেণ্ড ডবলিউ হেষ্টিংস, রেভারেণ্ড জেমস রবার্টসন, রেভারেণ্ড জন হেক্টর, রেভারেণ্ড

ডবলিউ স্মিথ, রেভারেণ্ড জন মরিসন, রেভারেণ্ড এ বি ওয়ান, রেভারেণ্ড জন ল্যাম্, রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার টমোরি, রেভারেণ্ড জে ওয়াট, রেভারেণ্ড ডবলিউ এস আরকুহার্ট থেকে বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ এইচ জে টেলার অবধি। অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম দিই। যাঁদের কথা আজও অনেকে মনে করেন তাঁদের সামান্য কয়েকজন—গৌরীশঙ্কর দে, পণ্ডিত বি এল ব্যানার্জি, হেনরী ষ্টিফেন, কালীচরণ ব্যানার্জি, পণ্ডিত কে পি মুখার্জি, আলেকজাণ্ডার টমসন, রেভারেণ্ড জি ইওয়ান, এ সি মুখার্জি, রায়বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন সার্ গুরুদাস প্রভৃতি ছাড়াও শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু, চীফ জাষ্টিস ডঃ এস আর দাস, ডঃ এন কে সিদ্ধান্ত, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বি আর সেন প্রভৃতি অনেকেই।

১৮৫৮-৫৯ সালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০০, যার মধ্যে তিনশ' ষাটজন মহিলা রয়েছেন। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে রয়েছেন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীসত্যপ্রিয় বিশ্বাস, শ্রীমতী মেরী যোশেফ, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকিরণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশান্তিকুমার মিত্র, শ্রীভুপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীভোলানাথ মুখার্জি, শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসনাতন মুখার্জি, তাঁদের বহু সহকর্মীসহ।

———

কলিকাতা মাদ্রাসা

কথায় বলে, কালো মেঘেরও রূপালী রেখা আছে। এভরী ডার্ক ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বলতে যে মানুষটিকে আমরা বুঝি, তা অতি ভয়াবহ। তাঁর কুশাসন ও কুকার্যের সুদীর্ঘ তালিকা আছে এডমণ্ড বার্কের বক্তৃতায়, কিন্তু তবু শুনলে অবাক হবেন, এই হেষ্টিংসই কলিকাতা মাদ্রাসার মত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা। শুধু জন্মদাতা নয় ৫৬৪১৲ টাকা দামে এই মাদ্রাসার জন্য কেনা জমিটি তাঁরই একক দান। কেবলমাত্র তাই নয়, এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় তিনি নিজের পকেট থেকে চালিয়েছেন একাধিক বছর। ২১শে জানুয়ারি, ১৭৮৫ সনে তাঁর ভারতবর্ষ ছাড়বার প্রাক্কালে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তিনি কেন করেন, তা জনসাধারণকে বোঝাতে গিয়ে হেষ্টিংস বললেন,— পুলিস এবং বিচারের কাজে নিযুক্ত মুসলমান কর্মচারীদের পার্শী ও আরবী ভালভাবে জানা উচিত, কেননা তা জানা না থাকলে মুসলমান আইনের খুঁটিনাটি জানা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

স্থাপনার কারণ যাই হোক, কলকাতা মাদ্রাসা যে কালক্রমে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ বৈঠকখানা রোডের একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। ১৭৮২ সনের এপ্রিল মাস অবধি হেষ্টিংসের একক দানে তা চলে এবং এই মাস থেকেই সরকার হেষ্টিংসের সুপারিশে বিদ্যালয়টির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই স্কুলটির প্রতি গোড়া থেকেই সরকারের বিশেষ আগ্রহ দেখা

যায় এবং বোধ হয় সেই কারণেই ১৯২৫ সন অবধি এখানে কোনও ভারতীয় অধ্যক্ষের স্থান হয়নি। সার ডেনিসন রস্, ই এইচ হার্লে প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। ১৯২৬ সনে প্রথম ভারতীয় যিনি এই শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর কামালউদ্দিন।

বৈঠকখানা রোড থেকে নতুন জমিতে স্কুল উঠে এল ১৮২৭ সনে। ওয়েলেসলি স্কোয়ারে, যেখানে এখনও বিদ্যায়তনটি রয়েছে।

শুধু সাহিত্য নয়, মুসলমানদের ইতিহাস, দর্শন, গ্রীক দর্শন, জুরিসপ্রুডেন্স, তফসীর (কোরাণিক সায়েন্সের পাঠ ও ব্যাখ্যা) ইত্যাদি নানা বিষয়ের উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নমানের পড়াবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। উপাধি অনুযায়ী আলিম, ফাজিল, হাই মাদ্রাসা প্রভৃতি ভাগে তাকে বিভক্ত করা। আলিমেরও আবার জুনিয়ার-সিনিয়ার ভাগ আছে।

১৯৫৮ সালে দেখছি প্রতিষ্ঠানটিতে তিনশ'য়ের মত ছাত্র আছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সন অবধি নানা পরীক্ষায় এখানে ৫৩১ জন ছাত্র অবতীর্ণ হয়েছে এবং ২৫৬ জন পাস করে বেরিয়ে গেছে।

যেদিন কলকাতা মাদ্রাসার ওয়েলেসলি স্কোয়ারের বাড়িতে গেলাম, দেখি সমস্ত বাড়িটায় রঙ করা হচ্ছে। সারানো হচ্ছে স্থানে স্থানে। দেশ বিভাগের শর্ত অনুযায়ী কলকাতা মাদ্রাসাকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করার সঙ্কল্প নেওয়া হয়, ফলে এদেশে কলকাতা মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য মাদ্রাসাগুলি পঙ্গু হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সনে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সমস্যাটির গুরুত্ব বুঝে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা মাদ্রাসাকে পুনরায় নবপর্যায়ে চালু করেছেন।

বেথুন কলেজ-কলেজিয়েট স্কুল

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের গেট দিয়ে বেথুন কলেজে প্রবেশ করলাম। হেমন্তের বেলা তিনটে। পশ্চিম আকাশের মিঠে রোদের দিকে পিছন ফিরে কলেজের সামনের ছোট্ট মাঠে দুটি মেয়ে বই-খাতা ছড়িয়ে বসে পড়েছে সবুজ ঘাসের উপরেই। নিশ্চিন্তে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

৭ই মে, ১৮৪৯ সন। জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তাঁর স্কুল খুললেন। সেদিনকার উৎসবে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অধিক ছিল না। না কলকাতার রাজা-মহারাজা ইত্যাদি গণ্যমান্য জন,



বেথুন কলেজ

না সরকারী হোমরা-চোমড়া ইংরেজ অফিসার। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিকে বেথুন নিমন্ত্রণ করলেন না ভয়ে। পাছে তাঁর

স্কুল খোলায় দেরি হয়। নিমন্ত্রিত হলেন না কলকাতাবাসী ইংরেজরাও। শুধু এ-কাজে যাঁরা তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরই তিনি ডাকলেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির কথা বলছি।

অতি সাধারণভাবে বেথুন মাত্র একুশটি ছাত্রী নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সিমুলিয়াস্থ বাসভবনের বৈঠকখানায় স্কুল খুললেন। নাম—ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। ঠিক হল, এখানকার শিক্ষা হবে অবৈতনিক। ছাত্রীরা, যারা আসবে অনেক দূর থেকে, তাদের বিনা ভাড়ায় স্কুলের গাড়ি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। যাদের অভিভাবকদের মত আছে, শুধু তাদেরই স্কুলে ইংরেজী শেখানো হবে। অন্যথা বাংলাতেই চালানো হবে স্কুলের যাবতীয় কাজ। ছাত্রীদের জন্য বিষয় নির্বাচিত হল—হাতের-লেখা, পড়তে শেখা, অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান, ভুগোল, এবং ছুঁচের কাজ। সমস্ত পাঠ্য-পুস্তক বিনামূল্যে এদের সরবরাহ করা হবে। যারা গাড়িতে আসতে রাজী নয়, তাদের জন্য পালকিও থাকবে। শুনলে হয়ত অবাক হবেন যে. প্রথম একুশটি ছাত্রীর মধ্যে দুজন ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালা।

বেথুনের স্কুল প্রতিষ্ঠার মাত্র পনর দিনের মধ্যে শোভাবাজার রাজবাটিতে ঐরকম আর-একটি স্কুল রাজা রাধাকান্ত দেবের আগ্রহে গড়ে ওঠে। এই সময়ে বারাসত, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানেও স্কুল খোলার চেষ্টা দেখা যায়।

স্কুল স্থাপনের প্রারম্ভে দক্ষিণারঞ্জনের দান স্মরণীয়। নিজ বৈঠকখানা-গৃহ ছাড়াও তিনি পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তকসহ

লাইব্রেরী, মির্জাপুরের নিকট পাঁচ বিঘা জমি স্কুলের জন্য দিতে রাজী হলেন।

বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ বেথুন নিজেই চালাতেন। প্রায় সাত-আট শ' টাকার মত খরচ পড়ত। তাঁর মৃত্যুর পর বড়লাট লর্ড ডালহৌসী বিদ্যালয়ের সব ভার গ্রহণ করেন। এই স্কুলটির প্রতি ডালহৌসী-পত্নীর বরাবরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এখনকার ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির শব্দ-মুখরিত কলকাতার চেহারার নিশ্চয়ই অনেক তফাৎ ছিল সেদিনের কলকাতার সঙ্গে। সেদিনের মির্জাপুর ছিল কলকাতার উপকণ্ঠ, ভদ্রপল্লী থেকে অনেক দূরে। সুতরাং বেথুন স্থির করলেন, দক্ষিণারঞ্জনের প্রদত্ত মির্জাপুরের জমিতে স্কুল করা চলবে না। তাতে ভদ্র গৃহস্থ-কন্যাগণের স্কুলে আসার অসুবিধা হবে। হেদুয়ার পাশে বাঙ্গলা সরকারের এক খণ্ড জমির সঙ্গে মির্জাপুরের জমিটি বদল করা হল। ১৮৫০ সনের ৬ই নভেম্বর মহাসমারোহে নতুন স্কুল বাড়ির পত্তন হল। এবারের উৎসবে তিনি ডাকলেন সকলকে। কেননা, তিনি বুঝেছেন, তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তার সফলতার দিকেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। নতুন গৃহনির্মাণের অধিকাংশ ব্যয়ভার বেথুন নিজেই বহন করেন। কিন্তু নতুন গৃহে স্কুল আসা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তার আগেই ১৮৫১ সনের ১২ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর এক মাস পরেই স্কুল হেদুয়ার বাড়িতে উঠে এল। বেথুনের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ কালীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে স্কুলের কাজে পান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

স্বীয় কন্যা সৌদামিনী দেবীকে স্কুলে পাঠালেন। এই সময় স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে হল আশি জন।

বেথুনের মৃত্যুর পর থেকে ১৮৫৬ সন অবধি বড়লাট ডালহৌসী স্কুলের সব ভার গ্রহণ করেন। তাঁর ভারত ত্যাগের পর স্কুলটির দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে সরকার গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ সন অবধি ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং বিদ্যালয়টির সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪২ সনের ১৫ই ডিসেম্বরের রিপোর্টে দেখা যায়, বিদ্যালয়টির ছাত্রী-সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৩ জন।

স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে কাদম্বনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুর নাম সর্বাগ্রে। ১৮৭৮ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কাদম্বনী প্রথম উত্তীর্ণ হলেন। তিনি বাংলার ছোটলাটের কাছ থেকে মাসিক পনেরো টাকার একটি বৃত্তি নিয়ে এফ-এ পড়া শুরু করেন। তারই জন্য বেথুন স্কুলে প্রথম এফ এ ক্লাস খোলা হয়। ১৮৭৮ সনের ১লা আগস্ট থেকে বেথুন স্কুল পুরাপুরিভাবে সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হিসাবে কাজ করতে থাকে।

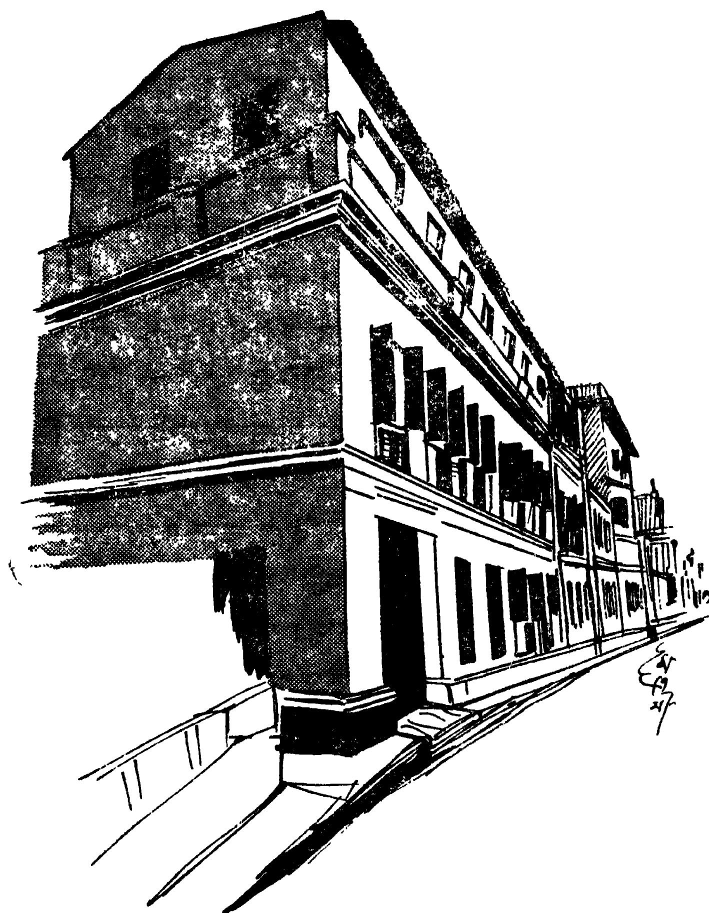
বেথুন কলেজের এফ এর প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী বসু ও শিক্ষক শশিভূষণ দত্ত। চন্দ্রমুখী বসুও নর্মাল স্কুলে এফ এ পড়েন এবং উভয়েই এফ এ পাশ করলে বেথুন স্কুলে তাঁদের জন্য বি এ ক্লাস খোলা হয়।

এর পরের বেথুন স্কুল-কলেজের ইতিহাস স্বাভাবিক নিয়মেই এগিয়ে গিয়েছে। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, শ্রদ্ধেয় জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতির সম্পাদনায় স্কুল-কলেজ একটু একটু করে এগিয়ে গিয়েছে সাফল্যের পথে। মিস এ এম রাইট, চন্দ্রমুখী বসু, হিরন্ময়ী সেন, রাজকুমারী দাস প্রভৃতির সুষ্ঠু পরিচালনায় বিদ্যালয়টির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হয়।

পূজাবকাশ। স্কুল-কলেজের মাঠ, বারান্দা, কমনরুম, ক্লাস, লাইব্রেরী, ল্যাবোরেটরী সব নিস্তব্ধ। অন্য সময় তা সহস্রাধিক ছাত্রীর গমনাগমনে সর্বদা সচকিত হয়ে থাকে। সে সময়ের কলেজ-অধ্যক্ষ মৃণালিনী এমার্সনের সঙ্গে কয়েকটি কথার পর ফিরে আসছি। দেখলাম, সেই মেয়ে দুটি তেমনি ঘাসের ওপর বসে। সামনে বই-খাতা ছড়ানো। অতি নিবিষ্টমনে পড়াশোনা করছে। পাশ দিয়ে এসেছি, গিয়েছি, তাদের তন্ময়তায় বিঘ্ন ঘটেনি। অনুমান করতে পারি, সেদিনকার ভুবনমালা আর কুন্দমালাকে—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই কন্যাকে। যেদিন প্রথমে স্কুলে এসেছিলেন, সেদিন কি দ্বিধায় দুলেছিল তাঁদের মন। সমস্ত সমাজের চোখ ছিল তাঁদের ওপর। কেউ মুখ ফিরিয়েছিল ঘৃণায়, কেউ ক্রোধে। অনুমান করা শক্ত নয়, কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসুর সমস্যা। যেদিন এফ এ পড়বেন ঠিক করলেন সেদিন কত বাধাই না তাঁদের ঠেলতে হয়েছে চারিটি কোমল হাত দিয়ে বলিষ্ঠ হৃদয়ে। ভুবনমালা আর কুন্দমালা, কাদম্বিনী বসু, আর চন্দ্রমুখী বসু আজকের বেথুন কলেজের ঘাসের উপর-বসা মেয়ে দুটির মধ্যে নিশ্চিন্ততা এনে দিয়েছে। তাঁদের সংগ্রাম এনে দিয়েছে এদের একাগ্রতা, কখনও, কোনও কারণেই যা ভেঙে যাবে না। হাতের লেখা, পড়তে শেখা, অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল ও ছুঁচের কাজ নিয়ে শুরু হয়েছিল যা, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, পদার্থ-রসায়ন বিদ্যায় তা রূপান্তরিত হয়েছে। পাটিগণিত রূপান্তরিত হয়েছে ডিফারেন্সিয়্যাল-ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাসে। একুশটি ছাত্রী একুশ শ' ছাত্রী হয়ে দেখা দিচ্ছে।

বিদ্যাসাগর কলেজ-মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন

দীর্ঘদিনব্যাপী বিতর্কের অবসান হল। ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, সরকারের যাবতীয় শিক্ষাবিষয়ক



বিদ্যাসাগর কলেজ

খরচ ইংরেজী পদ্ধতিজাত শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে। দেশে শিক্ষা বিস্তারে সরকারী যাবতীয় প্রচেষ্টা হবে পাশ্চাত্ত্যের

শিক্ষাপদ্ধতির অনুরূপ। ১৮১৭ সনে অর্থাৎ এই ঘোষণার কিছুদিন আগেই বসেছে হিন্দু কলেজ। ১৮২৩ সনে বসেছে জেনারাল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হল এবং লর্ড ক্যানিংয়ের (তখনকার গবর্ণর জেনারেল) তত্ত্বাবধানে ৪০ জনকে নিয়ে গঠন করা হল এক সংস্থ্যা যার মধ্যে পাঁচজন মাত্র ছিলেন ভারতীয় এবং এই পাঁচজন ভারতীয়ের মধ্যে চারজন বাঙালী। ঈশ্বরচন্দ্র, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় ও রামগোপাল ঘোষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা বসল ১৮৫৭ সনের মার্চ মাসে।

এই ঘটনার ঠিক দু বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৯ সনে শঙ্কর ঘোষ লেনে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক মিলিতভাবে ক্যালকাটা ট্রেণিং স্কুল নামে বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠিক এমনি সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে এই নূতন স্কুলের যাবতীয় কাজ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাদকরূপে স্কুলে যোগদান করেন। পরে ১৯৬৪ সনে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর স্কুলের সম্পূর্ণ ভার পুরাপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়ায় তিনি বিদ্যালয়ের ক্যালকাটা ট্রেণিং স্কুল নাম পালটে রাখেন হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন কিন্তু পরে ‘হিন্দু’ কথাটি বাদ দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্কুলের অনুমতির জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়।

তখন মেট্রোপলিটান স্কুলে সবে এফ এ ক্লাস চালু করার

চেষ্টা হচ্ছে। অধ্যক্ষ সূর্যকুমার অধিকারী বিদ্যাসাগরের কাছে প্রস্তাব আনলেন স্কুলের এই দিনটায় একটু-আধটু উৎসব হওয়া উচিত। বললেন, কলকাতাস্থ লাটসাহেব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখা প্রয়োজন। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, প্রতিভাবানেরাই দেশের ইতিহাস। সেদিনের ঈশ্বরচন্দ্র যে আগামীদিনের প্রতি মানুষের অন্তরে স্থান পাবেন তার বীজ সেদিন তিনি নিজে হাতেই বুনে গিয়েছেন তাঁর ছোটখাট কাজের মধ্য দিয়ে। অধ্যক্ষ সূর্যকুমারের প্রস্তাব শুনে তিনি মনে মনে হাসলেন। মুখে বললেন, কত খরচ হবে উৎসবের জন্য তার একটা হিসাব দাও। হিসাব করে দেখা গেল, উৎসবে পাঁচ-ছশ টাকার মত খরচা হবে। তিনি সব শুনে বললেন, আমার উৎসব করার দরকার নেই। এই টাকায় দরিদ্র ছাত্রদের কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাক। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যখন কনফারেন্স, মিটিং, কমিশন ইত্যাদি বসে তখন প্রায়ই ঈশ্বরচন্দ্রের এই কথাটুকু চিন্তা করি। ভাবি, ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর নাম সত্যিই সার্থক। তিনিই প্রকৃত শিক্ষক।

১৮৭২ সনে এফ এ, ১৮৭৯ সনে বি এ এবং ১৮৮২ সনে এখানে বি এল ক্লাস খোলা হল। ১৯০৭ সনে আই এস-সি, ১৯১০ সনে বি এস-সি এবং ১৯২৮ সনে বি, কম। ১৯৩১ সনে মেয়েদের বিভাগ।

এফ এ ক্লাস খোলার সময় কলেজে ভারী মজার একটি একটি ব্যাপার ঘটে। সকলেই বলতে থাকেন, এফ এ ক্লাসের ছাত্রদের ইংরাজী পড়ানো কোনও বাঙালীর কাজ না। সাহেব অধ্যাপক আনানো হোক। ইংরেজী ছাড়াও দর্শন, বিশেষ করে

পাশ্চাত্ত্যদর্শন, বিজ্ঞান এ সব কে পড়ায়। কিন্তু বিদ্যাসাগর এসব কাজে বাঙালী অধ্যাপকই আনালেন। লজিকের এক অধ্যাপক প্রথম দিন ক্লাসে এসে সমস্ত ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকলেন। এনট্রান্স-পাস বড় বড় ছেলে সামনে। কিন্তু তবু পরীক্ষার ফল ভালই হল। কলেজ থেকে যোগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। বাঙালীর যোগ্যতা প্রমাণিত হল।

বিদ্যাসাগর কলেজের এই কৃতিত্ব কিন্তু শুধু একা বিদ্যাসাগরের জন্যই সম্ভব হয়নি। তাঁর সঙ্গে যেসব শিক্ষক ছিলেন তাঁদের নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যথা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, বৈদ্যনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অনাদিকৃষ্ণ বসু, হেরম্বলাল গোস্বামী, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে দেওয়া উচিত। ১৯১৭ সনে বিদ্যালয়টির নাম রাখা হোল বিদ্যাসাগর কলেজ। এই সঙ্গে এ কলেজে যে সব অধ্যক্ষ কাজ করেছেন তাঁদেরও কয়েকটি নাম করা উচিত। যেমন সূর্যকুমার অধিকারী—এঁর কথা আগেই বলেছি, বৈদ্যনাথ বসু, এন এন ঘোষ, সারদারঞ্জন রায়, জে আর ব্যানার্জি, ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি। এর পরবর্তী অধ্যক্ষগণের নাম অনেকেরই জানা তাই আর তা দিলাম না। শিক্ষকেরাই এ কলেজের প্রাণস্বরূপ। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষকদের বলতেন, তোমরা কেউই বেতনভোগী ভৃত্য নও। তোমরা এই বিদ্যালয়ের অংশ। এমন দিনও তাই কলেজের ইতিহাসে গিয়েছে যখন শিক্ষকেরা স্বেচ্ছায় তাঁদের বেতন কম নিয়ে বিদ্যায়তনটিকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

বিদ্যালয় হল মানুষ-তৈরীর কারখানা আর শিক্ষক তার কারিগর। যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর যেন এখানে এক সমন্বয় ঘটেছে। তাই বেরিয়েছে প্রতিভাবান সব সুসন্তান। দেশের মুখ উজ্বল করেছেন তাঁরা। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁদের শীর্ষে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্র বা শিক্ষক হিসাবে যোগাযোগ ছিল সার্ সুরেন্দ্রনাথ, শ্রদ্ধেয় গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, সার্ পি সি রায়, সার্ নীলরতন সরকার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সার্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, জাষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখার্জি, সার্ যদুনাথ সরকার এবং আরও একাধিক বঙ্গ সন্তানের, জ্ঞানে, গুণে যাঁরা ছিলেন সমাজের শীর্ষে।

কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১৯৫৮-র হিসাবে প্রায় সাত হাজার। দিবা-বিভাগে ৩৫৫০, সকালে ১০৫০, বাণিজ্য-বিভাগে ৯৫০, সান্ধ্য-বিভাগে ১২৫০। আশা করা যায় বিদ্যালয়টি আগামী দিনের বাঙালী সমাজকে আরও একাধিক বিবেকানন্দের সন্ধান দিতে পারবে।

———

বঙ্গবাসী কলেজ-স্কুলে

বাইবেলে বলে, তিনকুড়ি দশ বছর না পেরোলে মানুষ পুরো হয় না। বঙ্গবাসী কলেজেরও তিনকুড়ি দশ বছর পেরিয়েছে। ১৯৫৮'র শেষে তার বয়স একাত্তর বছর।

বঙ্গবাসী কলেজের সিঁড়ি পেরিয়ে দোতালায় উঠছি, ঘণ্টা পড়ল। এক ক্লাস শেষ, আর এক ক্লাস আরম্ভ হবার ঘণ্টা।



বঙ্গবাসী কলেজ

দলে দলে ছেলে উঠছে, নামছে। ক্লাস বদল চলছে। এক-তলার তিন নম্বর ঘর থেকে হয়ত তিনতলার সতের নম্বর ঘরে। ভাল ছেলেরা ছুটছেই রীতিমত। আগে গিয়ে দখল করে বসতে হবে ফার্স্ট বেঞ্চের জায়গা। কেউ চলেছে ঝিমিয়ে

ঝিমিয়ে। আগে বসার কোনও তাগাদা নেই। কোন রকমে কোথাও বসতে পারলেই হল। ভাবটা যেন কলেজটা শুধু পার্সেণ্টেজ নেবার জায়গা, পড়াশোনা এখানে, নৈব নৈব চ। রাত দুটোয় আলো জ্বলবে তার ঘরে। কফি চলবে পেয়ালার পর পেয়ালা। পরীক্ষার নম্বর উঠবে ব্যারোমিটারের পারার মত। আবার এমনও আছে কেউ কেউ, যারা চলেছে সপারিষদ। জমিয়ে বসে যাবে শেষের দিকের কোনও বেঞ্চে। খাতার কাগজে অধ্যাপকের ব্যঙ্গচিত্র আঁকবে কেউ, চিঠি লিখবে কোনও আধ-জরুরী, মুখ নিচু করে গল্প করবে নিঃশব্দে। পরীক্ষায় নম্বর পাবে কম। জীবনযাত্রায় তাই বলে সবাই যে থাকবে পিছনে পড়ে কিছু এমনটি নয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি উপরে। পাশ থেকে একটি ছেলে ও-পাশের অন্য একটি ছেলেকে ডেকে বলছে, "ওমুকের ক্লাসে 'প্রক্সি'টা দিয়ে দিস ;" ঘাড় নেড়ে জবাব দিল ছেলেটি, "এ আর বেশী কথা কী! দেব।" আমি ডানহাতি বেঁকে প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকলাম।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী স্কুল। ১৮৮৭ সনে কলেজ। ১১৬নং বউবাজার ষ্ট্রীটে বারোজন ছেলে আর দুজন শিক্ষক নিয়ে শুরু হল কলেজের জীবনযাত্রা। আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু পুরোভাগে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের আশীর্বাদ আছে পাথেয়। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিন্‌হা, ভূপালচন্দ্র বসু প্রভৃতি একাধিক বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য-সহানুভূতি তাঁর আশ্রয়। ১৮৯৬ সন অবধি কলেজের পড়ানোর অনুমতি ছিল শুধুমাত্র ফার্স্ট আর্টস অবধি। কলেজের ছাত্রসংখ্যাও ক্রমেই বাড়ছে আশাতীতভাবে। ১৮৮৯ সনে তেতাল্লিশ জন থেকে ১৮৯৫ সনে একশ। ১৮৯৬ সনে এলো বি এ পড়াবার অনুমোদন। এই সময়ের কলেজের

পাঠ্যতালিকা দু' ভাগে বিভক্ত। আর্টস ও ল'। সাহিত্য ও আইন। তা ছাড়া এম এ পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাবার অনুমতিও তখন পাওয়া গিয়েছে। অধ্যাপক ই এম হুইলার এবং ললিত ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে ইংরেজীতে এম এ পড়ানো চলছে। ১৮৯৮ সনে ইন্দুমাধব মল্লিক, ইকমিক কুকারের আবিষ্কর্তা,—এই কলেজ থেকে এম এ পরীক্ষায় প্রথম সাফল্য-লাভ করলেন। ইতোমধ্যেই বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজের বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে দু'বার। শেষে ১৯০৩ সনে স্কট লেনের বর্তমান পরিবেশে এসে বসল কলেজ। ১৯০৪ সনে পাশ হল ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট। ১৯০৭ সন থেকে নতুন নতুন বিষয়বস্তু পড়ানো হতে লাগল কলেজে। বঙ্গবাসী কলেজ বারো হাজার টাকা ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট পেয়ে বসালো ল্যাবোরেটারি। ১৯১০ সনের মধ্যেই প্রায় সব বিষয়েই বি এ এবং বি এস-সি পড়াবার বন্দোবস্ত হল। কলেজের অধ্যাপক-মণ্ডলীতে তখন রয়েছেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন মিত্র, এ কে ঘোষ, পান্নালাল বসু (পরে শিক্ষামন্ত্রী), ভাগবত-কুমার শাস্ত্রী, শশিভূষণ সরকার প্রভৃতি। আইন বিভাগ শুরু হয় সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিন্‌হা (পরে লর্ড সিন্‌হা), ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির দ্বারা।

'বঙ্গবাসী' নামটির পেছনে একটু ইতিহাস আছে। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সঙ্গে তা যুক্ত। শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাব অনুসারেই 'বঙ্গবাসী' নামটি গ্রহণ করা হয়। আচার্য গিরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরেছেন দীর্ঘদিন, ১৯৩৮ অবধি। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি মারা যান এবং তখন থেকে একাকী এই প্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু,

গিরিশচন্দ্রের পুত্র। মৃত্যুর আগের দিনও গিরিশচন্দ্র 'রেক্টর' হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন।

সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা আজও বহু প্রাক্তন ছাত্রের মনে আছে নিশ্চয়ই। ১৯১৮ সন থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিনটি অবধি তিনি প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাজ করে গেছেন।

কলেজের ইতিহাসে একাধিক দিন ঘটনাবহুল। যেমন শুক্রবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনাহারে থেকে মারা গেলেন দেশবরেণ্য যতীন্দ্রনাথ দাস—এই কলেজের চতুর্থ বার্ষিক সাহিত্য বিভাগের ছাত্র, ছাত্র-সংসদের সভাপতি। সেদিন সারা কলেজ জুড়ে নামল বিষাদের ছায়া, গভীর দুঃখে নিমগ্ন হয়ে এল মন। আজও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গর্বের সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে থাকেন। কৃতী ছাত্রদের নামের তালিকা অতি দীর্ঘ। তবু কয়েকজনের নাম দিতেই হবে। সর্বশ্রী মন্মথ বসু, সীতারাম ব্যানার্জি, ডাঃ সুবোধ মিত্র, তুষারকান্তি ঘোষ, সুধীররঞ্জন দাস, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে বসন্তকুমার দাস, সতীশচন্দ্র সামন্ত, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, অমর নন্দী, অমূল্যকুমার সেন, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। খেলায় পঙ্কজ গুপ্ত, শৈলেশ চ্যাটার্জি, অশোক দত্ত, নরেশ তালুকদার, অমলেন্দু বসু, সুকুমার দত্ত, যামিনী রায়, ভবতোষ ভট্টাচার্য, শৈলেশ্বর মিশ্র, পরেশ মুখার্জি, সুনীল ঘোষ, রবীন ভট্টাচার্য, গিয়াসউদ্দিন প্রভৃতি এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। শ্রদ্ধেয় মন্মথ বসু প্রভৃতি ছাড়াও রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার হরিহর গাঙ্গুলী, হেমচন্দ্র নস্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ভূপালচন্দ্র বসু, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বসু, শরৎকুমার চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক, মোহিনীমোহন মিত্র, বরদাদাস বসু, ই এম হুইলার, শরৎ মজুমদার, ভগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিরজামোহন মজুমদার, কালীপদ গুপ্ত, কালিদাস মল্লিক, পান্নালাল বসু, অক্ষয়কুমার ঘোষ, যদুলাল কাঞ্জিলাল, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, কুঞ্জ নাগ, শশিভূষণ সরকার, মোহিনীমোহন মিত্র, লর্ড সিন্‌হা, সুরেশচন্দ্র ঘটক, অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী চক্রবর্তী, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীনাথ ঘোষ, পুলিন কর, হরেন্দ্রনাথ মিত্র, পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি, রোহিণীকুমার মজুমদার, লাডলিমোহন মিত্র, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

এর পর কলেজ এগিয়ে গিয়েছে আরও অধিকতর সাফল্যের পথে। বারোজন ছাত্র নিয়ে যে বিদ্যায়তনটির জন্ম হয়েছিল, ১৯৫৮-তে তার ছাত্রসংখ্যা কেবলমাত্র আই এ আই এস-সি, বি এ, বি এস-সিতেই ছ' হাজার ছ'শ তেত্রিশ জন। কমার্স বিভাগ আলাদা। স্থানাভাব এখানে ভীষণ। ১৯০৩ সনে যখন কলেজ এল এখানে তখন চারিদিকে ছিল বস্তি। এখানকার পরিবেশ ছিল না স্কুল-কলেজের উপযোগী। তবু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সুবিধা দেবার জন্য সচেষ্ট। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৈরী হয়েছে কমন রুম, জিমনাসিয়াম, ক্যান্টিন। শুধু এদিকে নয়, শিক্ষার প্রসারের দিকেও রয়েছে নজর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বায়োলজীর গবেষণাগারটির নির্মাণ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মিত্র ইনষ্টিটিউশন

কাদামাটি নিয়ে খেলা করে ভাস্কর। তাল তাল কাদা নিয়ে বসে। জল দেয় আর মাটি চটকায়। ছোট ছোট কাঁকর, খড়, লতাপাতা অতি সন্তর্পণে একটি একটি করে বেছে বার করে। ধীরে ধীরে মাটির রঙ ফেরে, নরম হয় মাটি, উপযুক্ত হয় তা প্রতিমা গড়ার। ভাস্করের হাতে মাটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। রঙ লাগে তার গায়ে, পুতুলে প্রাণসঞ্চার হয়। তেমনি এই বিদ্যালয়। শিক্ষকের খেলাঘর। ছোট ছোট ছেলে আসে স্কুলে, আধো আধো কথা কয়, যেন তাল তাল মাটি। একখানি কিছু না লেখা শ্লেট। সাদা ধবধবে। তাতে আঁচড় পড়ে একটির পর একটি। দাগের পর দাগে ভরে ওঠে শিশুর মন। যেমন তুলির টানে টানে জীবন্ত হয় প্রতিমা। তারপর একদিন বাজারের সওদার মতো চলে যায় তা। শ্যামল একখানা মুখ, এক মাথা চুল, দোহারা চেহারা কেমন ভীতু ভীতু ভাবটা শুধু মনে দাগ রেখে যায়। চেনা নাম হারিয়ে যায় নতুন নামের ভীড়ে। আজকের গড়া পুতুলটা গতকালের গড়া পুতুলগুলোর ভীড়ে মিশে যায়। ছোট ছোট দাগ পা'র ঘুচে হয় একাকার নব নব পদতাড়নায়। পাঠশালা সত্যিই যেন পান্থশালা। পান্থশালায় আসে কতো যাত্রী, প্রতি যাত্রীকে কে মনে রাখে। শুধু মনে থাকে তাদের সবাইয়ের একটা জমাট বাঁধা চেহারা। সে চেহারায় পথের কষ্টের ছাপ কম, আগ্রহ তীর্থের পথের। ভগবানের প্রতি তার আকর্ষণ, পথ তো শুধু সেই চরমে পৌঁছাবার সাধনা মাত্র। মিত্র ইনষ্টিটিউশনের হেড মাষ্টারমশাই তেমনি করে অতীতের পানে

চেয়ে রইলেন আমার প্রশ্ন পেয়ে, বলুন মাষ্টারমশাই, আপনার সব ছাত্রদের নাম, যারা আজ জ্ঞানে-গুণে সমাজের সকলের শীর্ষে। সুরেন মজুমদার, ডাক্তার প্রশান্ত ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবেশচন্দ্র দাস, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশু বসু, মাইশোরের চীফ জাষ্টিস এস আর দাশগুপ্ত আরও কত কে যে ছাত্র—বলতে বলতে হাসতে লাগলেন তিনি, কতো কেউ যে বলে আমি আপনাদের ছাত্র, ক'জনকেই বা আর মনে রাখতে পেরেছি বলুন। ভাবলাম, তাই হয়, পুরোনো পুতুল নতুন পুতুলের ভীড়ে হারিয়ে যায়, হারিয়ে যায় পুরোনো মানুষ নতুন মানুষের ভীড়ে। কবি বলেছেন, মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে।

১৮৯৮ সনের ৫ই জানুয়ারী মাত্র ৫টি ছেলে নিয়ে শ্রীসতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিত্র ইনষ্টিটিউশনের পত্তন করলেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র এর প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীসতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রধান শিক্ষক। ১৯০৪ সনে স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন এবং সেই বৎসরেই স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯০৬ সন থেকে স্কুলের ছেলেরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বসতে আরম্ভ করল।

পাঁচটি ছেলে নিয়ে যে বিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছিল, আজ সেখানে ন'শয়ের মতো ছেলে পড়ছে। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্কুল হল এরই মধ্যে। খোলা হল গানের ক্লাস। মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন হোল ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে। সেখানে প্রার চার শ'র মতো ছাত্রী রয়েছে ১৯৫৮র খাতায়।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

মফঃস্বলে যাচ্ছিলাম। বেশী দূরে নয়, কলকাতা থেকে মাত্র আট মাইল, কোন্নগরে। পাশে বসা ছেলেটির কোলের ওপর দুখানা বই জ্যামিতি আর ইংরাজী, সঙ্গে একটা প্র্যাকটিক্যাল খাতা, গোটা দুই একসারসাইজ বুক। প্র্যাকটিক্যাল খাতাটির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। আলাপ জমালাম। কোথায় থাকো? কোন্নগরেই। আরে আমিও তো যাচ্ছি সেখানে। কোন্নগরেই বাড়ী করেছেন তার বাবা পশ্চিম থেকে ফিরে এসে। পশ্চিমের এক কয়লা খনিতে কাজ করতেন। প্রায় সারা জীবনটাই কেটেছে মাটির নীচে ধোঁয়া আর ধূলোয়, কয়লা আর কাদার মধ্যে। এখন শহর ছেড়ে একান্তে বাসা বেঁধেছেন।



সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

ছেলেটি বলল, কাতরাসগড়ের বাংলোটার মধ্যে কতো জায়গা জানেন, এপাশে ওপাশে গোলপোস্ট পুঁতে ফুটবল খেলা যায়। আকাশ সেখানে কত বিস্তৃত, কতো উন্মুক্ত সেখানের প্রান্তর। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে ভাল লাগছে না? উত্তর পেলাম, হাঁপিয়ে উঠছি। হাজার হাজার ছেলে যখন কলেজের সিঁড়ি দিয়ে ওঠে-নামে, এ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে যখন ল্যাবরেটারির

বাতাস ভরে ওঠে, তখন কেমন যেন খোলা হাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করে ।

১৮৮২ সালে প্রেসিডেন্সী স্কুলে যোগদান করলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো প্রতিভার হাতে পড়ে অচিরেই স্কুলটি কলেজে পরিণত হল। ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্সী ইনষ্টিটিউশন আই এ অবধি পড়াবার অনুমতি পেলো। ঐ বছরের শেষের দিকেই প্রেসিডেন্সী ইনষ্টিটিউসন পুরোপুরি ডিগ্রী কলেজ খোলার অনুমতি পায় এবং কলেজের নাম পালটিয়ে রাখা হয় রিপণ কলেজ। ১৮৮৫ সালে আইন পড়াবার অনুমোদন এল এবং রিপণ ল' কলেজ স্থাপিত হল সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯৪০ সালে শুরু হয়েছে বাণিজ্য বিভাগ। ১৯৪৭ সালে সান্ধ্য বিভাগ এবং ১৯৪৮ সালে এসেছে মহিলা বিভাগ। ১৯৪৮-৪৯ সালে রিপণ কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

আজ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ৪টি ভাগ—কলা এবং বিজ্ঞান, আইন, বাণিজ্য এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুল। ১৯৫৭ সালের এক রিপোর্টে দেখছি, কলেজের কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রসংখ্যা দিবা বিভাগে তিন হাজার ছিয়াশী, অতিরিক্ত বিজ্ঞান বিভাগে সাতশ সত্তর, মহিলা বিভাগে ছ'শ পঞ্চাশ। আইন কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছ'শ ত্রিশ। আইন কলেজ বসে বিকালে। বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ৯৯১, দিনে এবং ১৯৬৩ জন রাত্রে। কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এগারোশো পঁচাত্তর। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের আর্টস ও সায়েন্স বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরমণীমোহন রায়, ল'কলেজে শ্রদ্ধেয় আর বি বক্সী, বাণিজ্য বিভাগে শ্রদ্ধেয় এ কে ঘোষাল। কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক

শ্রদ্ধেয় এস সি চক্রবর্তী। কলা ও বিজ্ঞানের জন্য শিক্ষক রয়েছেন দিবা বিভাগ, অতিরিক্ত বিজ্ঞান এবং মহিলা বিভাগে যথাক্রমে ৮৪, ৪৬, এবং ১৮ জন। আইন কলেজে এগারো। বাণিজ্য বিভাগে সাতচল্লিশ। কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ৩৪। প্রাইমারী বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ১৬২, শিক্ষক নয়জন।

দিবা বিভাগের, অধ্যক্ষের সঙ্গে কলেজের স্থান সংক্ষেপ সম্পর্কেই কথা বলছিলাম। কোন্নগরের পথে কয়েক দিন আগে দেখা ছেলেটির আক্ষেপ ভুলিনি। উনি বললেন, নতুন বাড়ি তৈরী করে ছাত্রদের আরও অধিক স্থান সঙ্কুলানের চেষ্টা চলেছে। আঠারো লাখ টাকার বাজেট, সরকারের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা ছাড়াও কলেজের ছেলেরা দিয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এ বাড়ির ভিত পুতেছিলেন স্যার এডওয়ার্ড বেকার, বাঙলার গভর্নর ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৫৭ সালের ২০শে জানুয়ারী নতুন বাড়ির ভিত স্থাপন করেছেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকায় প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম রয়েছে। নাম রয়েছে শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাঙলার গভর্নর হিসাবে সারা বাঙলাদেশ আজও যাঁকে মনে করে রেখেছে। সর্বশ্রী হরিসাধন ঘোষচৌধুরী, ডাঃ নীলরতন ধর, নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ ইত্যাদি বহুজন আছেন সে তালিকায়, সমাজের নানাবিভাগে যাঁরা থেকেছেন শীর্ষে। খেলার জগতের শৈলেন মান্না, এস দে প্রভৃতিও এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

অধ্যাপক হিসাবে এখানে কাজ করেছেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। অধ্যক্ষ হিসাবে থেকেছেন সর্বশ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস,

দেবশঙ্কর দে, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জানকীনাথ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ রায়, প্রফুল্লকুমার গুহ, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, দেবপ্রসাদ ঘোষ ইত্যাদি অনেকেই যাঁদের অধ্যাপনার খ্যাতি আজও বাঙলাদেশ জুড়ে।

কলেজের ১৯৫৮-৫৯র খাতায় ছাত্রসংখ্যা আর্টস ও সায়েন্সে চার হাজার দু'শ আটাত্তর, বাণিজ্য বিভাগে তিন হাজার তিনশ' আঠাশ, আইনে ছ'শ ত্রিশ, মোট আট হাজার দুশো ছত্রিশ।

বৈঠকখানা রোডের বর্তমান কলেজ বাটীর নিকটেই জমি সংগ্রহ করেছেন কর্তৃপক্ষ। নতুন বাড়ি উঠছে। এখানে হয়ত কোন্নগরের সেই ছেলেটির হাঁফ ছাড়বার অবকাশ মিলবে। এ ছাড়া গবেষণা বিভাগ, প্রকাশনা, সাময়িকপত্র প্রকাশ, সহরের বাইরে ছাত্রদের জন্য খোলা হাওয়ায় হোস্টেল, সুইমিং পুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি করবার পরিকল্পনা আছে তাঁদের।

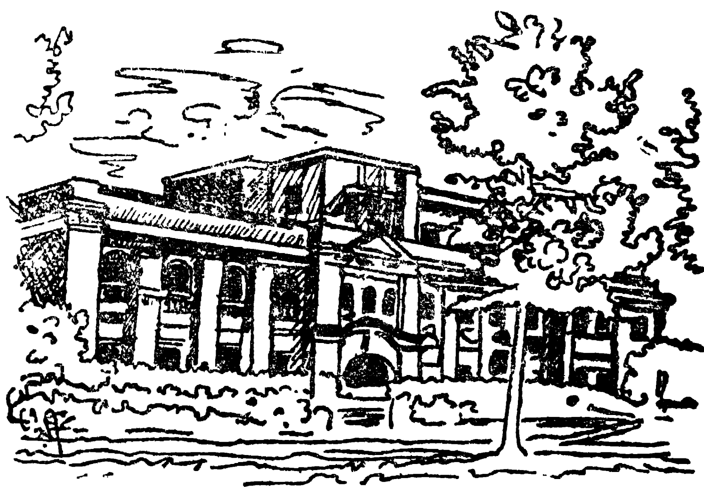
———

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের এণ্ট্রান্স ক্লাসের বড় একটি মেয়ে কি জানি একটা খুব খারাপ বই পড়ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে ; তাই নিয়ে সারা স্কুল সেদিন তোলপাড়। হেডমাষ্টার মহাশয়ের মুখে হাসি নেই, ছাত্রীরা সব ভয়ে জড়সড়, মাষ্টারমশাইয়েরা সব গম্ভীর। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, সেদিনকার সেই হতভাগ্য মেয়েটির শাস্তি পাওয়ার কারণ ছিল একখানি উপন্যাস। উপন্যাসখানি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত 'দেবী চৌধুরাণী'। এমনি ছিল সেকালের কড়া শাসন। জনৈকা প্রাক্তন ছাত্রী লিখেছেন,······বোর্ডিংয়ের মেয়েদের উপর নিত্যনূতন নিষেধ জারির অন্ত থাকত না। জানালার ধারে দাঁড়াবে না, ছাদের কার্ণিসে ঝুঁকে রাস্তা দেখবে না, বারান্দায় যাবে না, চাকর-দরোয়ানের সঙ্গে কথা বলবে না, যদি তের বৎসরের বেশী বয়স হয়, তবে মাথায় ঘোমটা দিতে হবে। মনে পড়ে, একদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছে না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। বলাই বাহুল্য, ইলেকট্রিকের কথাই শুনিনি, তো ফ্যান। পরামর্শ হোল জানালার মোটা পর্দাগুলো একটু সরিয়ে দিই। সব বিধিনিষেধ ভুলে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনি, কে যেন মোটা গলায় বলে উঠল, জানালার গোড়ায় দাঁড়ানো হচ্ছে, কাল ঠিক—দি-কে বলে দেবো। চমকে দেখি, রেলিং ঘেরা কম্পাউণ্ডের বাইরে ছুটি লোক। কোথায় গেল গরম, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা! সব এক অবস্থা!······ আজ মেয়েদের স্কুলে কত রকমের খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদের

ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা লুকোচুরি, কুমীর-কুমীর কি ভাত-আসন ছাড়া অন্য খেলা জানতামই না। ছাদের কার্ণিস ঝুঁকে দেখলে শাস্তি ছিল টাস্ক লেখা, পঞ্চাশবার একই কথা, আর কার্ণিসে ঝুঁকে দেখব না।

১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাসভবনে অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিপরীত দিকের লাল-বাড়ীতে, বাইরের বাড়ীতে দুর্গাদালানে শিক্ষালয়ের পত্তন হোল।



ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

প্রধান উদ্যোক্তা অক্লান্ত কর্মী শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাশ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির কথাও বিদ্যালয়টির স্থাপনের ইতিহাস-রচয়িতার মনে পড়বে। আরও মনে পড়বে সরলাবালা রায় ও লেডী অবলা বসু—দুই ভগ্নীর কথা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম না পেলে শিক্ষালয়টির উন্নতি এত সত্বর হোত কল্পনাতীত।

সেদিনকার স্কুলের জীবনযাত্রা ছিল অতি সহজ। আশাতীত রকমের কম ব্যয়ে সেদিন ছাত্রীরা বোর্ডিংয়ে থাকতে পেতো। বোর্ডিংয়ের খরচা, স্কুলের ফিস্ সমেত ছিল সাড়ে এগারো টাকা। একই বাড়ীর দুটি মেয়ে একসঙ্গে পড়লে লাগতো সাড়ে ন' টাকা করে।

সেদিনকার একজন বোর্ডিংবাসী ছাত্রীর জীবনের একমাত্র আশ্রয় ছিল বোর্ডিং-এর ছাতটুকু। সেখানেই বিকেলে বেড়ানো ছিল একমাত্র স্বাধীনতা। তাও কার্ণিসের কাছে যাওয়া চলতো না। তাকিয়ে থাকতে হতো আকাশের দিকে। গল্প করতে হোত পরস্পরের সঙ্গে।

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, অবিনাশচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, লাবণ্যপ্রভা সরকার (আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী), শশিভূষণ বসু, ভবসিন্ধু দত্ত, অন্নদাচরণ সেন, নেপালচন্দ্র রায়, গোলকচন্দ্র দাস, অধরচন্দ্র দাস প্রভৃতি ছিলেন সেকালের শিক্ষক। এফ সেকার প্রায় তেত্রিশ বছর প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করে গেছেন এখানে। কাজ করেছেন জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকুমারী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

হ্যারিসন রোডে যেদিন বিজলী বাতির আলো এলো, তার কয়েক দিন আগেই স্কুল ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে ৭০নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে উঠে এসেছে। এই দিনটির বর্ণনা প্রসঙ্গে সেদিনের স্কুলের জনৈকা ছাত্রী বলেছেন, কিছুদিন ধরে বড়দের বলতে শুনতাম যে, শীঘ্রই নাকি হ্যারিসন রোডে ইলেকট্রিক আসবে।···এখানে এসে রাস্তায় বড় বড় পোষ্ট ও তাদের মাথায় নতুন রকম সব আলোর ডোম দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠলাম···কটা দিন কি উত্তেজনায় যে কাটল।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনা-আপনি দপ্ করে একসঙ্গে সবগুলো বাতি জ্বলে উঠল—সে কি অপূর্ব শোভা, আলোয় আলোময়, ঠিক যেন পরীর দেশ! বারান্দায় যাওয়ার নিষেধের বালাই তুলে নেওয়া হোল, আব রাস্তায় সে কি ভীড়! সারা কলকাতা ভেঙ্গে পড়ল এই অদ্ভুত আলো দেখতে; আর সেই সঙ্গে দলে দলে কীর্তন খোল করতাল বাজিয়ে সারারাত সে যেন এক মহোৎসব চলল। আমরাও সারা রাত জেগে দেখতে লাগলাম। আলো দেখে দেখে যেন আশ মিটছিল না।

এমনি ছিল সেকালের কলকাতা। বেথুন, লরেটো প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষায়তন সারা দেশের অগণিত স্ত্রীজাতির আশার আলো হিসাবে দেখা দিয়েছিল সেদিন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মতো স্কুল জাতির ভবিষ্যৎ পথ দেখাচ্ছে তখন।

শ্রীমতী অমিয়া দাশগুপ্ত, সর্বশ্রী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, রমা চৌধুরী, সুপ্রভা চৌধুরী, নলিনী দাস, কল্যাণী প্রামাণিক, বাণী রায়, সুবর্ণা মিত্র, শান্তা দেব, সুষমা সেনগুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী যাদের কথা এখুনি মনে পড়ছে। ৭০নং হ্যারিসন রোড থেকে স্কুল উঠে গেল ৫৬নং মির্জাপুরে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। সেখান থেকে আপার সার্কুলার রোডের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কয়েকটি ছাত্রীকে নিয়ে যে অতি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির পত্তন হয়েছিল, আজ তার ছাত্রীসংখ্যা নয় শত। সেকেণ্ডারীতে পাঁচ শত পঞ্চাশ, প্রাইমারীতে দুই শত ত্রিশ ও মণ্টেসরীতে একশত কুড়ি। বিদ্যালয়ের মণ্টেসরী বিভাগটি অতি পুরাতন। ১৯৩০ সাল থেকে মিসেস্ নলিনী রাহা এটির ভার নিয়েছেন।

আশুতোষ কলেজ

ডাভটন কলেজ আর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি উঠে গেল ১৯১১ সালে। সারা দক্ষিণ কলকাতায় তখন আর কলেজ নেই কোনও। পড়ুয়ারা যায় কোথায়! অতএব জন্ম হল এক নতুন কলেজের যার নাম সাউথ সুবার্বণ কলেজ। যার জন্ম



আশুতোষ কলেজ

বলতে পারি ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী পনেরো অর্থাৎ যেদিন এই কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল। স্থান ২৬, ল্যান্স-ডাউন রোড। ১৯১৬ সালের মে মাসে সম্মতি মিললো কলেজ

স্থাপনার, যুগপৎ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের শিক্ষা বিভাগের কাছ থেকে। প্রথম গভর্নিং বডি তৈরী হল। তাতে থাকলেন স্যর আশুতোষ, জাষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি। অধ্যক্ষ হলেন শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন সিংহ। শিক্ষক হিসাবে এলেন সোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাদাস মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অমলকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীর মাসিক ভাড়া ঠিক হল আড়াই শ' টাকা। ১৯১৬ সালের ১৭ই জুলাই বসল কলেজ। ২৮৮ জন তখন এর ছাত্রসংখ্যা।

কলেজ শীঘ্রই উঠে এল ১৫৭, রসা রোডে। ১৯১৮-১৯ সালে এলো বি এ অবধি পড়াবার অনুমতি। ১৯২৪ সালের জুন মাসে স্যর আশুতোষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কলেজের নাম পরিবর্তিত করে রাখা হল আশুতোষ কলেজ, তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য। এইদিন থেকে কলেজের ভার নিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সভাপতি হিসেবে। ১৯৩৫ সালে নতুন বাড়ীতে এসেছে কলেজ। দু'লক্ষ চৌদ্দ হাজার চার শ' উনসত্তর টাকা খরচ হয় এটি তৈরী করতে।

বর্তমানে কলেজের হোস্টেল রয়েছে দু'টি, একটি কালীঘাট রোডে ও অপরটি বসন্ত বোস রোডে।

২৮৮ জন ছাত্র নিয়ে যে কলেজের পত্তন হয়েছিল আজ তার ছাত্রসংখ্যা শুনে অবাক হতে হবে। শুধুমাত্র দিবা বিভাগের আশুতোষ কলেজেই ৩৯০০ জন ছাত্র রয়েছে। ১৯৩২ সালের

জুন মাসে খোলা হয়েছিল সকালের মেয়েদের বিভাগ মাত্র ৫৫টি ছাত্রী নিয়ে। আজ তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'হাজারে। ১৯৪৫-৪৬ সালে খোলা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রসংখ্যা সেদিন ছিল ৩৫৬ আজ তা হয়েছে ১৫০০ জন। এ হিসাব ১৯৫৯ সালের গোড়ার।

কলেজের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। তিনি দুঃখ করে বলছিলেন, গভর্ণমেণ্ট বলছে ছাত্র কমাও। ছাত্র কমালে পড়াশোনা ভালো হয় একথা কি আমরা জানি না। কিন্তু কোথায় যাবে এইসব হাজার হাজার ছেলে। সরকারী কলেজগুলিতে প্রথম বিভাগে অত্যধিক নম্বর না পেলে জায়গা পাওয়া যাবে না। কোথায় যাবে তাহলে এরা? ছেলেদের যখন ভর্তি হওয়ার সময় তখন একবার এসে এখানে বসে দেখবেন তো অবস্থাটা। এইসব ছেলে নিয়ে গড়ে তুলতে হয় আমাদের। না হলে কোথায় ফেলবো এদের। শুধু কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমালেই কি মিটবে সমস্যাটা! দু'একটাও ভালো ছেলে যদি আসে এখানে! কত আশা নিয়ে বসে থাকি!

সতেরো জন শিক্ষক নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল যে কলেজ আজ সেখানে শিক্ষক আছেন নব্বই জন, প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছাড়া। শুধু আশুতোষ কলেজ দিবা বিভাগে। তা ছাড়া বাণিজ্য বিভাগে রয়েছেন একত্রিশ জন, প্রিন্সিপ্যালসহ। মহিলা বিভাগে পঁয়তাল্লিশ জন।

২৬, ল্যান্সডাউন রোডের সেই অপরিসর কলেজটি বেড়ে আজ ২৬,২০০ বর্গফুট জায়গা করেছে নতুন বাড়ীতে। ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছে সেই হারে। ১৯১৬-১৭ সালে ২৮৮ জন ছাত্রের কথা আগেই বলেছি, ১৯৩২-৩৩শে তাই বেড়ে

৭৮৭ জন, ১৯৪৫-৪৬শে ২৮২৬ জন। এখনকার ছাত্রসংখ্যার আভাষ আগেই দিয়েছি। এই হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে বেরিয়েছেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডক্টর সনৎ বোস, ডক্টর এস কে বিশ্বাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সুরজিৎ লাহিড়ী, পূরবী মুখোপাধ্যায়, বিনয় দাশগুপ্ত প্রভৃতি। নাম যা তখনি মনে এল ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় তাই বললেন। আরও বললেন, অনেকে এ কলেজের ছাত্র কিন্তু হঠাৎ তো মনে পড়ছে না সবায়ের নাম। মহিলা বিভাগে পড়েছেন বেলা মুখোপাধ্যায়, বাণী ঘোষাল, গায়ত্রী বোস প্রভৃতি একাধিক সুগায়িকা।

১৯৫৯-এর গোড়ায় কলেজের তিনটি বিভাগে তিনজন অধ্যক্ষ। শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল যথাক্রমে দিবা বিভাগে প্রভাতে ও সন্ধ্যায়। সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে রয়েছেন শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী এ ছাড়াও শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রবোধ-রঞ্জন সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযামিনীমোহন কর, শ্রীকান্তিচন্দ্র মাইতি, শ্রীপরিমল কর, শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিদ্যুৎবরণ নাথ প্রভৃতি বহু অধ্যাপকও।

অধ্যক্ষ হিসাবে এখানে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন সিংহ। ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল অবধি। তারপর সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এসেছেন দিবা বিভাগে। কাজ করেছেন ১৯৫৬ অবধি। তারপর এসেছেন বর্তমান অধ্যক্ষ।

কলেজের একটি সুগঠিত পাঠাগার রয়েছে যার পুস্তক সংখ্যা ২০,০০০-এর মতো।

সিটি কলেজ

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় সেন গল্প বলছিলেন। সত্য ঘটনাই, কিন্তু মনে হয় যেন গল্পের মতো। বলছিলেন তখন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় হেরম্ব মৈত্র। শ্রী সেন কলেজের ছাত্র। সিটি কলেজেরই। ফল ভাল ছিল। ভাবলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে পড়বেন বি-এ-টা। শুধু ভাবা নয়, দরখাস্তও করলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে জায়গা মিলল সহজেই। পথে একদিন অধ্যক্ষ হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করতেই বললেন, শুনলাম আমাদের ছেড়ে যাচ্ছো! সেটি হচ্ছে না। আমি আমাদের ছেলে ছাড়বো না। সেদিনই মত পরিবর্তন করে সিটি কলেজে এসেই আবার ঢুকলেন তিনি। অমিয়বাবুর কথা শুনতে শুনতে সেদিনই শোনা আশুতোষ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের দুঃখের কথাটা মনে পড়ছিল, দু' একটা ভালো ছেলেও যদি আসে এখানে। কত আশা নিয়ে বসে থাকি।

অমিয়বাবু বলছিলেন, এখানকার অধ্যক্ষরা ছিলেন সব এমনি। শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত, হেরম্ব মৈত্র, রজনীকান্ত গুহ, সুরেশচন্দ্র রায়, নিরঞ্জন নিয়োগী সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করে গেছেন।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথিবীর সব দেশেই প্রথম পর্য্যায়ে কোনও একটি, দুটি কি কয়েকটি মহানুভব ব্যক্তির চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবাসদন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্ভব হয় এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অর্থে ও অন্যান্য নানা সাহায্যে। আমাদের দেশে তো এমন হয়েছে হামেশাই। সিটি কলেজের

বেলাতেও তার অন্যথা ঘটেনি। ১৮৭৯ সালে শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কলেজটির ভিত্তি স্থাপিত হয় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে। ৬ই জানুয়ারী, ১৮৭৯ সাল এই তারিখেই বিদ্যালয়টীর জন্ম হয়। এ কাজে আনন্দমোহনের সহায় ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথ এখানে অধ্যাপনাও করেছেন। বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় স্বয়ং আনন্দমোহনই বহন করতেন। ১৮৮১ সালে সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াও



সিটি কলেজ

শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বোস, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্যায়তনটির মধ্যে আসেন ও ফলে এটির প্রভুত উন্নতি ঘটে। ১৮৮১ সালেই এখানে এফ এ ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮৩ সালে আইন এবং ১৮৮৪ সালে ডিগ্রী ক্লাসসমুহের অনুমতি মেলে এখানে।

১৩নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কলেজ আসে ১৮৮৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর। লর্ড রিপন কলেজের নতুন বাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র তদানীন্তন কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ১০২।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে উঠে আসে কলেজ।

১৯৩৯ সালে একটি পৃথক বাণিজ্য বিভাগের পত্তন হোল সিটি কলেজের অপর একটি অংশ হিসাবে। ১৯৪৩ সালে খোলা হয়েছে মেয়েদের বিভাগ। বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়েছে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে মাত্র আটটি ক্লাসরুম নিয়ে।

সিটি কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, হীরালাল হালদার, এ সি মিত্র, ডি এম বসু, প্রিয়দারঞ্জন রায়, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে কলেজটির উন্নতি। এই প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানাঙ্কুর দে, প্রেমাঙ্কুর দে, অমল হোম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর জে সি বর্ধন, ডক্টর এইচ কে সেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ, এস এন ব্যানার্জি আই সি এস, ডক্টর অনন্তকুমার সেন, বি কে আচার্য আই সি এস, বরদানন্দ চ্যাটার্জি, জনাব আবদুস সাত্তার, আসামের শ্রীঅমিয় কুমার দাস, ডক্টর বি সি গুহ, ডক্টর জে এন রায় প্রভৃতি বহু নাম উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে যে কটি নাম মনে পড়েছে তাই লিখছি। এ ছাড়া আরও বহু ছাত্র নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা জ্ঞানেগুণে সমাজের শীর্ষে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং এখনও রয়েছেন।

আগেই বলেছি বাণিজ্য বিভাগটি শুরু হয়েছে ১৯৩৯ সালে। বিভাগটি খোলার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে শ্রদ্ধেয় এস এম বোস, ডক্টর ডি এম বোস, অমিয় সেন, জে দে, আই সি এস প্রভৃতির। মাত্র উনিশজন শিক্ষক নিয়ে কাজ আরম্ভ হল। লাইব্রেরীতে ৬৫২ খানি বই। মাত্র দশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে শিক্ষকের সংখ্যা বেড়ে হলো একশো সাতাশ। এই দশ বছরের মধ্যে কলেজ পত্রিকার জন্ম হয়েছে, ভোকেশ্যানাল ট্রেণিং সেকসন খোলা হয়েছে, টিউটোরিয়েলের বন্দোবস্ত হয়েছে, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম বসেছে, সকালের বিভাগ খোলা হয়েছে, চাকুরী সংস্থানের জন্য সাহায্য সমিতি বা এমপ্লয়েমেণ্ট এ্যাডভাইসারি ব্যুরো হয়েছে। পাঠাগারের জন্য পৃথক গৃহ, প্রকাশনা বিভাগ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সান্ধ্য বিভাগ, কলেজ সমবায় সমিতি, দিবা বি কম ক্লাস, দক্ষিণ কলকাতা শাখা, একটি রসায়নাগার প্রভৃতি বহু কিছু সম্ভব হয়েছে ইতোমধ্যে। কলেজের ছাত্রদের জন্য হয়েছে হেলথ সেণ্টার, অধ্যাপকদের জন্য ঘাটশীলার বিশ্রামনিকেতন, অবসর সময়ে যেখানে বসে শরীর ফেরানো চলে।

ইংরাজী, বাঙলা, হিন্দী, উর্দু, মালয়লম, গুজরাটি প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা ছাড়াও এখানে বিসনেস অর্গানিজেশন, বুক কিপিং ও এ্যাকাউণ্টেন্সি, কমার্শিয়াল ল', অডিট, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স, পাবলিক ফাইনান্স প্রভৃতি বহু বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। অধ্যক্ষ রয়েছেন শ্রীঅরুণকুমার সেন প্রথম থেকেই। সেক্রেটারী হিসাবে রয়েছেন শ্রীকেশবেশ্বর বসু। সকালের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীএস সি সেনগুপ্ত। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সহকারী অধ্যক্ষ রয়েছেন শ্রীআর এন মিত্র সন্ধ্যায়, শ্রীটি চক্রবর্তী

দিনে। কারিগরী শিক্ষার বিভাগেও আছেন শ্রীএস সি সেনগুপ্ত। তাঁদের ঘিরে আছেন দুই শতাধিক অধ্যাপক যাঁদের চেষ্টাতে বিভাগটির সুনাম বর্ধিত হয়েছে কালক্রমে।

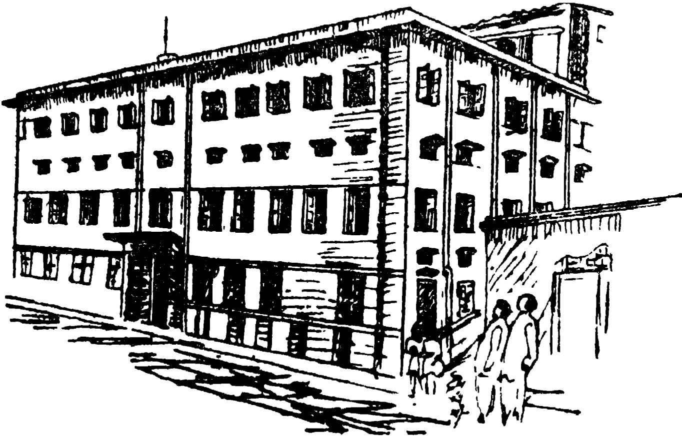
অল্প দিনের ইতিহাসেও কলেজটির একাধিক ছাত্রের নাম করা যায়, যাঁরা আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৪১ সাল থেকে প্রতি বছরই কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ফল করেছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্তী, শ্রীপ্রসাদকুমার ঘোষ, শ্রীসুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এখান থেকে।

সমস্ত কলেজ মিলিয়ে কিঞ্চিদধিক চৌদ্দ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে এখানে। ১৯৫৯ সালের প্রথমে।

———

চারুচন্দ্র কলেজ

এমন দিনও ছিল যেদিন উত্তর কলকাতার লোক দক্ষিণ কলকাতায় যাওয়াটাকে বিদেশ যাত্রা বলে মনে করেছে। কলকাতার ওপাশের সীমা তখন গড়ের মাঠের কাছাকাছি। সাহেবসুবোর আস্তানা সেখানে, ফোর্টের গোরা সৈনিকদের ভীড়। সেসব ছাড়িয়ে কালেভদ্রে এ অঞ্চলের মানুষ তীর্থে যেতো কালীঘাটে। কিন্তু কালের চাকা ঘুরলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই বাড়তে লাগলো কলকাতা। সরকারী



চারুচন্দ্র কলেজ

দপ্তরখানা বাড়লো, বাড়লো নানা বেসরকারী সওদাগরী অফিস। গঞ্জ বাড়লো, বাড়লো লোকজনের যাতায়াত। তাই একটু একটু করে বাড়লো সহরও। আর তা বেশী বাড়লো দক্ষিণেই। ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, টালীগঞ্জের বনেদ গাঁথা হোল নতুন করে। মাপ কষে বসলো বসতি, চওড়া চওড়া বেরোলো ইম্প্রুভমেণ্ট

ট্রাষ্টের রাস্তা সরকারী নক্সা অনুযায়ী। দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়। কলকাতার লোক চাল-কয়লা-কাপড়-কেরোসিনের দোকানে লাইন দিল। তবু সহরে বাড়তেই লাগলো ভীড়। সাময়িকভাবে বোমার ভয়ে খালি হল সহর কিন্তু অচিরেই আবার জমে উঠল হাট-বাজার। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলে গেল, তবু সহর বাড়লো। এলো দেশ বিভাগ। সিমলা থেকে র‍্যাডক্লিফকে ডেকে পাঠালেন বড়লাট ম্যাউণ্টব্যাটেন। বাঁটোয়ারা ক'রো দুই দেশ বাঙলা আর পাঞ্জাব।

পূর্ব বাংলার মানুষ এসে সহরের পরিধি বাড়ালো আরো। কলেজ বলতে দক্ষিণ কলকাতায় তখন শুধুমাত্র আশুতোষ কলেজেই। লোক বেড়েছে যখন তখন স্বভাবতই প্রশ্ন এল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার।

প্রায় প্রতিটি বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোড়াতেই দেখা যায় একটি দু'টি কি কয়েকটি মানুষের সযত্ন অক্লান্ত পরিশ্রম। চারুচন্দ্র কলেজের বেলাতেও তার অন্যথা হয়নি। ডক্টর চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যার নামে এই কলেজটি তাঁরই একান্ত পরিশ্রমে কলেজটি স্থাপনা সম্ভবপর হয়। কলেজ স্থাপনার ব্যাপারে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য ও ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ রায়। উভয়েই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে এসেছেন। দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতি ইনষ্টিট্যুশনের বাড়ীটি সকালে ক্লাস করার জন্য ভাড়া নিয়ে খোলা হল কলেজ। আই, এ ও আই, কম পড়াবার অনুমতি পাওয়া গেল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি কলেজের দ্বারোদঘাটন হল। অধ্যক্ষ ডাঃ এস এন রায়। ১৫ জন

সদস্যসহ একটি এ্যাড-হক কমিটি তৈরী করা হল যার সভাপতি হলেন অবসরপ্রাপ্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস। কলেজের ক্লাস শুরু হল ১লা অক্টোবর থেকে।

প্রথম থেকেই এখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম বছরে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৬ ও ছাত্রীসংখ্যা মাত্র চার। এর পরের বছরেই খোলা হল আই, এস, সি, বি, এ ও বি-কম। রাতের আই, কম ও বি, কম ক্লাসও খোলা হল সঙ্গে সঙ্গে।

এই বছরেই তীর্থপতির বাড়ী ছেড়ে কলেজ বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠে এল লেকের ধারে। মাসিক ভাড়া সাতশো টাকা। প্রথম বছর কলেজে যেসব অধ্যাপক আসেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার ডক্টর স্থকুমার গাঙ্গুলী আছেন। আরও আছেন শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডক্টর কে এম বস্থ, ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি।

বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হল ১৯৪৯ সালে লেকের বাড়ীতে। লেক রোডেই আর একটা একতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে চলতে থাকে কলা বিভাগ। পরে বাড়ী দোতলা হলে কলা বিভাগটিও উঠে আসে এখানে। ডক্টর মনোমোহন ঘোষের পর ডক্টর কে এম বস্থ সহঃ অধ্যক্ষ হলেন। এখন তিনিই অধ্যক্ষ। ডক্টর রায় অবসর নিয়েছেন। নৈশ বিভাগে এখন বি এ অবধি পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এ বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস। ১৯৫৯ সালে দেখেছি দিবা বিভাগে বি এস-সি খোলার চেষ্টা চলেছে। এ বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ রয়েছেন ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। দিবা বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ১৭০০ ও রাতের ছাত্রসংখ্যা ১১০০।